আসা-যাওয়ার পথের ধারে

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

পূর্ণ প্রকাশন
৮এ, টেমার লেন
কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীরথীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
৮এ, টেমার লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : চৈত্র, ১৩৬৮

প্রচ্ছদ : শচীন বিশ্বাস

মুদ্রাকর :
শ্রীরতিকান্ত ঘোষ
দি সত্যনারায়ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
২০৯-এ, বিধান সরণি
কলিকাতা-৭

উৎসর্গ

শ্রীমান বিকাশ বসু

পরম-প্রীতিভাজনেষু

এই লেখকের :

রাণী কাহিনী
কলকাতার কাছেই
পৌষ-ফাগুনের পালা
বহ্নিবন্যা
স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্
মনে ছিল আশা
সোহাগ পুরা
সমুদ্রের চূড়া
কোলাহল
জ্যোতিষী
আব্ছায়া
প্রেরণা
ছুটি
প্রভাত-সূর্য
যোগাযোগ
কুবেরের অভিশাপ
পুনর্ণবা
নববধূ
নীলকণ্ঠী
রাত্রির সীমানা
রক্ত কমল
নবজন্ম
গল্প-পঞ্চাশৎ
স্বপ্নিলাগর
তব দক্ষিণ পাণি
একদা কী করিয়া
উপকণ্ঠে
দহন ও দীপ্তি
আমি কান পেতে রই
ভাড়াটে বাড়ি
শুভবিবাহ কথা
এক প্রহরের খেলা
জীবন-স্বপ্ন
জন্মেছি এই দেশে
নারী ও নিয়তি
রাত্রির তপস্যা
বিধিলিপি
তবু মনে রেখো
রমণীর মন
তারা ভৈরবী
রাতের বলা
স্মরণীয় দিন
বিজয়িনী
স্বপ্ন আমার জোনাকি
জায়া নয় দয়িতা
বাহির বিশ্ব
শ্রেষ্ঠ গল্প
দেহ-দেউল
কঠিন মায়া
স্বপ্ন সন্ধ্যা

ইত্যাদি—

॥ এক ॥

রাত ন'টাকে এককালে কলকাতায় সন্ধ্যা বলা হ'ত।

তখন রাস্তায় গাড়ির শব্দ কখন বন্ধ হয় আর কখন শেষ হয়—কেউ টের পেত না।

মনে হ'ত সারারাতই কলকাতা শব্দমুখর, জাগ্রত থাকে।

রাত দেড়টা-দুটোয় থিয়েটার ভেঙে গেলে—বেরিয়ে গাড়ি ট্যাক্সীর জন্যে ভাবতে হ'ত না।

গভীর রাত্রে হাসপাতাল যাবার প্রয়োজন হলেও মাথায় হাত চাপড়াতে হ'ত না।

এখন—বিশেষ কোন কোন পাড়ায়—ন'টা মানে গভীর রাত।

হায় সে সব দিন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় শহর কি আর পূর্ব-গৌরব ফিরে পাবে?

ভয়ে আধ-মরা শহর কি আর বেঁচে উঠবে কোন দিন?

সেদিন পৌনে ন'টার সময়ই কলেজ স্ট্রীটে বেরিয়ে মনে হল রাত বারোটা কখন বেজে গেছে।

বার বার সকলে ঘড়ি দেখতে লাগলুম—কোন ঘড়ি পৌনে ন'টায় থেমে আছে কি না।

শেষে পরস্পরের সঙ্গে ঘড়ি মিলিয়ে, কানে চেপে টিকটিক আওয়াজ হচ্ছে কি না দেখে বুঝলুম, সত্যিই, তখনও রাত ন'টা বাজতে অনেক দেরি।

অর্থাৎ আগেকার দিন হ'লে ভীড় ঠেলে পথে চলাই দুরূহ হ'ত।

এ রকম চলছে কিছুদিন ধরেই।

আটটার পর থেকেই লোক দ্রুত হাঁটতে থাকে।

ট্রামে-বাসে বাদুড়ঝোলা ভীড় হয়। হ্যাণ্ডেল ধরেই নয় শুধু, ট্রামের

সামনে, পাশে পাশে রেলিং ধরে—বাসের পেছনে চড়েও বহু লোক যায়।

সকলেই চায়—কোনমতে ঘরে গিয়ে ঢুকতে।

যদি একবার পৌঁছে যেতে পারে, সেদিনের মতো প্রাণটা রক্ষা পেল বুঝবে। যদি এক জীবনমরণ সমস্যা দেখা না দেয়—অর্থাৎ গুরুতর কোন অসুখ কারও না থাকে—তা'হলে আর বাড়ি থেকে বেরোয় না।

সাধারণ শত প্রয়োজনেও না। শখ ক'রে আত্মীয়বাড়ি যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না ; দূরে কোথাও নিমন্ত্রণ থাকলেও যায় না কেউ। বিশেষ বাধ্যবাধকতা না থাকলে যায় না অন্তত।

কে জানে কখন কোথায় কি হাঙ্গামা বেধে যায়। তার ওপর অসময়ে যানবাহন বন্ধ হওয়াটা আজকাল নিত্য-নৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায়।

আমোদ-আহ্লাদের কথাও ভুলতে বসেছে লোকে।

শুনছি এ পাড়ায় অনেক সিনেমা রাত ন'টার শো বন্ধ করে দিয়েছে।

সে জায়গায় কেউ দশটায়, কেউ দুপুরে শো দিতে শুরু করেছে।

তবু ঠিক এতটা থমথমে হয় না কোনদিন।

এ যেন নিশুতি রাত হয়ে গেছে এর মধ্যেই।...কে জানে, আজ হয়তো একটা বিশেষ কিছু ঘটেছে কোথাও।

খুন ? না, খুনে কেউ আর অত ভয় পায় না।

তার চেয়েও বেশি কিছু হয়েছে হয়ত।

দু'দলে খণ্ডযুদ্ধ বা ঐ রকম কিছু।

কথাটা আরও মনে হল যখন দেখলুম—বেশ খানিকটা দাঁড়াবার পরও ট্রামের দেখা পাওয়া গেল না—সরকারী এমন কি বেসরকারী প্রাইভেট বাসও, যাকে আমরা প্রায় তাবৎ লোকই 'পাবলিক

বাস' বলে অভিহিত ক'রে থাকি—রাস্তা থেকে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়েছে।

এখন কথা হল, যাই কোথায় ?

বাড়ি ফেরার কী উপায় ?

স্টেশনে গিয়ে ট্রেনের চেষ্টা দেখব ?

কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরেই আমাদের সুবার্বান লাইনের ট্রেনের যা অবস্থা দেখছি—কখনও তার চুরি কখনও ব্যাটারি চুরির অজুহাতে—ট্রেন চলাটাই বিস্ময়কর ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে—না-চলা নয়।

যদি কোনদিন স্টেশনে গিয়ে দেখি কোন ট্রেন ঠিক সময়ে আসছে, তাহ'লে যেন কৃতার্থ বোধ করি।

সেই দুঃখে গত মাসখানেক ও-পথ ছেড়েই দিয়েছি, মান্থলি টিকিট থাকা সত্ত্বেও বাস-এ যাতায়াত করি।

টিকিট অবশ্য আমাদের অধিকাংশেরই আছে।

না থাকলেও ক্ষতি হ'ত না।

কেউ এ সময় টিকিট দেখতে চাইত না।

আর, আমরা এখন যথেষ্ট স্বাধীন হয়েছি—দেখতে চাইলেই বা দেখাচ্ছে কে ?

আমরা যারা এখনও সমাজ-সচেতন হয়ে উঠতে পারি নি, তারাই বোকার মতো টিকিট কেটে যাই।

যাই হোক—এমনিই তো ঠিক নেই গাড়ি ছাড়ার—আজ যা অবস্থা দেখছি, আজ কি কোন ট্রেন আদৌ ছাড়বে ?

যদি বা ছাড়ে, আমাদের মতো ট্রামে-বাসের যাত্রী এমন অনেকেই তো গিয়ে ভীড় করেছে, শিয়ালদা সাউথ অর্থাৎ কিনা বেলেঘাটা স্টেশনে নিশ্চয়ই তিল ধরবারও ঠাঁই নেই। আশু যে কোন গাড়িতে উঠতে পারব—এটা ভাবাও বাতুলতা।

সুতরাং—?

ট্যাক্সী ডাকব ?

ট্যাক্সীটা অবশ্য চলতে দেখছি।

কিন্তু আমরা তো মোট ছ'জন।

পাঁচজন তো প্রত্যহই হয়—আজ আবার দিব্যেন্দু জুটেছে আমাদের দলে।

তার ও পাড়ায় নাকি আজ আর যাওয়ার উপায় নেই, ওর দাদা ফোন ক'রে বলে দিলেন। ওকে গিয়ে আমাদের পাড়ায় কোন বন্ধুর বাড়ি রাত কাটাতে হবে।

ছ'জনকে কি কোন ট্যাক্সী নেবে?

রাত-বিরেতে একটাকা আট আনা কবুল করলে পাঁচজন পর্যন্ত নেয়—তাও অনেক বাহানা করে।

কিন্তু ছ'জন শুনলে হয়তো মারতে উঠবে একেবারে।

বিশেষ যদি ড্রাইভারের সঙ্গে আর একজন লোক থাকে তা'হলে তো কথাই নেই। উঠবে কোথায় এতগুলো লোক?

তবু উপায় যখন নেই—তখন বলতেই হবে।

হয়তো শেষ পর্যন্ত কেউ রাজী হয়ে গেলেও যেতে পারে।

না হয় দুটো টাকাই নেবে।

আমাদেরও বলার মুখ আছে। আজকের এই রাত, কোন সাধারণ যানবাহন যখন নেই রাস্তায়—তখন পুলিসও অত মাথা ঘামাবে না—একখানা গাড়িতে ক'জন উঠল না উঠল তা নিয়ে।

এমনিও বিশেষ মাথা ঘামাতে দেখি না আজকাল, বেআইনী আচরণটাই আজকাল স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।

কিন্তু কথা হচ্ছে, ট্যাক্সীও তখন বিরল হয়ে এসেছে পথে।

যাও বা যাচ্ছে—বোঝাই হয়ে।

অনেকক্ষণ—প্রায় মিনিট দশেক দাঁড়াবার পর প্রথম যে খালি গাড়ি পেলুম তার চালক সর্দারজী থমকে দাঁড়িয়ে মাথা ক'টা গুনতি ক'রে নিয়েই বিরস বদনে জানালেন, 'হামারা মিট্টর ঠিক নেহি হ্যায়।'

এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে চোখের নিমেষে উধাও হয়ে গেলেন।

তারপর আর একটি গাড়ি এল—চালকের সঙ্গে সঙ্গী নিয়ে। সে বললে, 'হাম তিন আদমী লে লেঁতে হ্যায়—আপ আউর এক ট্যাক্সী কর লিজিয়ে।'

আউর এক ট্যাক্সী কোথায় পাব—এর কোন সদুত্তর দিতে পারল না অবশ্যই।

সে সময়ও ছিল না। স্টার্ট বন্ধও করে নি—সদুপদেশ দিয়েই গাড়ি ছেড়ে দিল।

আজকালকার দিনে, বিশেষ এমন রাত্রে ট্যাক্সীতে চড়ার মতো খদ্দেরের অভাব নেই

অতঃপর—আরও মিনিট কতক ছুটোছুটি ক'রে—যখন সকলেই তিক্ত-বিরক্ত হয়ে উঠেছি—স্টেশনেই একবার কপাল ঠুকে দেখব অথবা হেঁটেই পাড়ি দেব এতটা পথ ভাবছি—হাঁটতে আপত্তি নেই, কিন্তু এই ছ'জন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক লোক একসঙ্গে হেঁটে যাচ্ছি এতে পাড়ার লোক, মানে যে পাড়া দিয়ে যাব, সন্দেহ ক'রে বোমা ফেলবে, কিংবা পুলিস সন্দেহ করে থানায় নিয়ে যাবে—দুটো সম্ভাবনাই প্রবল বোধ হওয়াতে তেমন উৎসাহ বোধ করছি নে—এই যখন অবস্থা, তখন হঠাৎ একটি ট্যাক্সী এগিয়ে এসে আমাদের সামনেই দাঁড়াল।

'কী দাদারা, কতদূর যাবেন?'

বেশ অমায়িক প্রশ্ন।

প্রশ্নের ভঙ্গীটাও বেশ প্রফুল্ল, ইংরেজিতে যাকে cheerful বলে।

পথের আলো যেটুকু পড়েছে গাড়িতে তাতে মুখ-চোখ তত ভাল ঠাহর হয় না—তবে আকৃতিটা আশ্বাসপ্রদ। বেশ ভদ্র বলিষ্ঠ ধরনের গঠন, দোহারা চেহারা এবং পরনে ফরসা শার্টপ্যাণ্ট, এটা নজরে পড়ল।

ঠিক সাধারণত যে শ্রেণীর ট্যাক্সী-ড্রাইভার দেখি যেতে-আসতে, তেমন নয়।

হয়তো এ-ই মালিক।

ভদ্রঘরের লোক তাতে সন্দেহ নেই।

চ্যাংড়াও নয়—বয়স আন্দাজ চল্লিশ তো বটেই।

যাই হোক—এসব দেখাশোনা তো পরে—ততক্ষণে আমরা সাগ্রহে এগিয়ে গিয়ে ঘিরে ধরেছি তাঁকে।

জায়গাটা শুনে মন্তব্য করলেন ভদ্রলোক, 'চলতে পারে। তা এত জন তো যাওয়া চলবে না। আর একটা ট্যাক্সী ক'রে নিন—তিন-তিনজনে ভাগ হয়ে বেশ আরামে যেতে পারবেন।'

আমারই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল কথাটা, 'ডেকে দিন না একটা!'

হা-হা ক'রে হেসে উঠলেন তিনি, 'ঠকিয়েছেন বটে।...তা নিন, উঠেই পড়ুন। সামনে দু'জন পেছনে চারজন। তবে ঐ যা ইউজুয়াল—কিছু বেশি দেবেন। ডবল চাইছি না, যৎকিঞ্চিৎ হিসেবের বাইরে পেলেই খুশি।'

আবারও হাসলেন। বেশ দিলখোলা উন্মুক্ত উদার হাসি।

আমরাও আর দ্বিরুক্তি করলুম না।

অপেক্ষাকৃত মোটা দু'জনকে সামনে দিয়ে চারজন মাঝারি এবং পাতলা মিলিয়ে পেছনে বসলুম।

॥ দুই ॥

গাড়ি ছাড়ল। আমরাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে থিতিয়ে গুছিয়ে বসলুম।

যাদের ধূমপানের অভ্যাস—তারা মুখে-আগুনে মন দিল।

মন নিশ্চিন্ত হ'লে রসনাও রসিকতা-মুখর হয়ে উঠবে, এটা স্বাভাবিক।

এ ক্ষেত্রেই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন ?

আমাদের প্রভাস আবার রসিকতা করতে গেলেই আদিরসে মত্ত হয়ে ওঠে।

প্রাচীনকালে যাকে বলা হত 'জুগুপ্সিত উক্তি', এখন যা চ্যাংড়াদের পাল্লায় পড়ে 'খিস্তি' হয়ে উঠেছে—তার কিছু বাহুল্য দেখা গেল।

অনেকক্ষণের দুর্ভাবনা থেকে মুক্তি পাবারই ফল বোধহয় এটা। প্রভাসকে খুব দোষও দিতে পারি না।

তা ছাড়া এ এমনই একটা অভ্যাস, অনেকক্ষণ না মুখ খুলতে পারলে হাঁপ ধরে।

খানিকটা পরে মণিময়ই প্রথম সচেতন হয়ে উঠল, বলল, 'এই, কী শুরু করেছিস! ড্রাইভার দাদা কি ভাবছেন বল্ তো আমাদের!'

'কিছু না, কিছু না। বিলক্ষণ। আমরা আবার কি ভাবব!' ড্রাইভার ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'আরে, আমরা কি মানুষ—যন্তরের মতো বসে বসে যন্তর চালিয়ে আমরাও এই যন্তরটারই একটা অংশ বনে গেছি। অন্তত আমাদের তা-ই ভাবে লোকে।'

এই বলে খুব খানিকটা হেসে নিলেন ভদ্রলোক।

তারপর বললেন, 'এখানে বসে আমাদের যা শুনতে হয় আর দেখতে হয় তা আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না! আমাদের মানুষ বলে ভাবলে আর সে-সব কথা বলতে পারতেন না কেউ··· শুধু কি পার্সোনাল ব্যাপার, বড় বড় রাজনীতির কথা—গোপন কথা, যা একেবারেই কাউকে জানানো উচিত নয়, তাও এখানে বসে নিশ্চিন্ত মনে আলোচনা করেন অনেকে, একবারও তাঁদের মনে পড়ে না যে, আমাদের কান আছে আমরা শুনতে পাই এবং জিভ আছে কথা কইতে পারি। বিশেষ যে দল বা যে-সব লোকের সর্বনাশ করবার মতলব আঁটছেন তাঁরা—তাঁদের সঙ্গেও এইসব ট্যাক্সী-ড্রাইভারদের যোগাযোগ থাকতে পারে, হয়তো ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ও থাকতে পারে কেউ।···কে জানে, এত যারা বুদ্ধিমান, তাদেরও এই জায়গাতে এসে মাথাটা কেমন ডাল্ হয়ে যায়।'

'তা আপনারা এসব ফাঁসও তো ক'রে দেন মধ্যে মধ্যে?' প্রশ্ন করি।

'কে করে জানি না, আদৌ কেউ করে কিনা। করা উচিত নয় অন্তত। এও এক রকমের প্রোফেশন্যাল বিশ্বস্ততার প্রশ্ন। তারা জেনে-শুনে না করুক খানিকটা বিশ্বাস তো করে, তাদের সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করা ঠিক নয়। আমি তো অন্তত করি না। আর কি জানেন, আমাদের এই স্টিয়ারিং-এর কাছ থেকে সাড়া-শব্দ গেলেই প্যাসেঞ্জাররা সাবধান হয়ে যাবে, কাঠ হয়ে বসে থাকবে—আমাদের যে ছুটো মজা দেখা তা আর হয়ে উঠবে না।···এ বেশ আছি, উঁচু দেখে বেঁধেছি টং, বসে বসে দেখছি রং!'

ভদ্রলোক যে সাধারণ ট্যাক্সী-ড্রাইভার নন, অশিক্ষিত বা অক্ষর-পরিচয়-মাত্র-ধারী স্বল্পশিক্ষিত যে সব ড্রাইভারদের দেখি সে রকম নন—তা ততক্ষণে বেশ পরিষ্কার হয়ে উঠেছে।

মণিময় বোধহয় এই কথাটা মনে রেখেই প্রশ্ন করল, 'গাড়ি কি আপনার?'

'নাও বটে, হ্যাঁও বটে।'

'তার মানে?'

'মানে ট্যাক্সীটা এককালে আমারই ছিল, অবস্থা-বিপর্যয়ে গাড়ি বেচে দিতে হয়েছে। এখন নতুন মালিকের কাছ থেকে নিয়ে কমিশনে চালাই।'

'আপনি লেখাপড়া কতদূর করেছেন?' সূর্য প্রশ্ন করল।

'লেখাপড়া?' আবারও হেসে উঠলেন ভদ্রলোক, তবে এবারের হাসিটা যেন ঠিক আগের মতো প্রসন্ন উদার নয়, কোথায় যেন একটু করুণ রসের আভাস আছে বলে মনে হ'ল। বললেন, 'দূর মশাই। লেখাপড়া শিখলে কি আর গাড়ি চালাতে আসি!'

'তার কোন মানে নেই।' আমি বলি, 'একবার আমার সঙ্গে ইউনিভার্সিটির দুই নাম-করা জাঁদরেল প্রোফেসার আসছিলেন, দু'-জনেই চেয়ার-হোল্ডার, মানে হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট—কথায় কথায় তাঁদের মধ্যে ইংরিজী কাব্যের আলোচনা উঠল—তার মাঝখানে হঠাৎ যে ভদ্রলোক গাড়ি চালাচ্ছিলেন, একটি মন্তব্য করে বসলেন। আমরা তো অবাক। অবাক তাঁর আস্পদ্দা দেখে নয়—তাঁর লেখাপড়া দেখে। একধরনের লোক আছে যারা না বুঝে-সুঝে বিদ্যে জাহির করার জন্যে দুমদাম কথা বলে বসে—অপ্রাসঙ্গিক—এ সে রকম নয়। ঠিক জায়গায় ঠিক কথাটাই বলেছেন ভদ্রলোক, সমঝদারের মতো। খুব ভাল পড়াশুনো আর রসবোধ না থাকলে সে-কথা বলা যায় না।···তারপর সারাটা রাস্তাই ওঁরা তিনজনে শেক্সপীয়ার নিয়ে আলোচনা করতে করতে এলেন—একবার কারও মনে হ'ল না যে, ব্যাপারটা বে-মানান হয়ে যাচ্ছে। বরং আমিই নির্বাক হয়ে বসে রইলুম তার মধ্যে—হংসমধ্যে বকো যথা।'

'তা আছে।' উনি সায় দিলেন, 'এমন এক একজন লোক আছেন আমাদের মধ্যে সত্যিই—তবে তাঁরা বেশির ভাগই মালিক, ওনার-ড্রাইভার। বাইরের লোককে কমিশনে ছেড়ে দেয়—আবার নিজেরাও

চালায় কখনও কখনও। তবে আমি একজনকে জানি—ইংরেজিতে এম. এ. পর্যন্ত পড়েছিল, তার পরেও লেখাপড়া করেছে অনেক—কোন এক বিখ্যাত দেশনেতার জ্ঞাতি—চাকরি করবে না বলে এই প্রোফেশন নিয়েছে। তবে তার নিজের গাড়ি নয়, কমিশনেই চালায়।'

আমি এবার ফাঁক পেয়ে চেপে ধরলুম, 'কিন্তু আপনি ফাঁকি দিয়ে এড়িয়ে যাচ্ছেন, কথাটা ঠিক ক'রে বলুন দিকি কতটা লেখাপড়া করেছেন?'

একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'নিতান্তই শুনবেন? স্টিয়ারিং হাতে, সামনে মায়ের ছবি—মিছে কথা বলব না, কষ্টেছিষ্টে বি.এ.-টা পাস করছিলুম। অনার্স ছিল না, হাতে পয়সাও না—তাই এম. এ. আর পড়া হয় নি। ভেবেছিলুম বঙ্গবাসীতে ইভ্‌নিং ক্লাস হয় এম. এ.-র, তাতেই ভর্তি হব, তাও আর হয়ে উঠল না। তার আগেই সংসারে জড়িয়ে পড়লুম—লেখাপড়াকে গুডবাই করতে হ'ল।'

দীপুর বরাবরই ঝোঁক সংসারের দিকে, এই বয়সেই তার যা কিছু স্বপ্ন কল্পনা সব তার ভাবী বধূ ও সংসারকে কেন্দ্র ক'রে—সব কথা ছেড়ে সে এবার প্রশ্ন ক'রে বসল, 'আপনার কি খুব বড় সংসার? ছেলেপুলে ক'টি আপনার?'

'নাঃ! সে-সব বালাই নেই। ঢাকীসুদ্ধ বিসর্জন যাকে বলে। ছেলে-মেয়ে হবার আগেই বৌ গেছে। সংসারের ভাবনা ভাবতে হয় না।'

'তা আর বিয়ে করেন নি?' আমি জিজ্ঞাসা করি।

'না। শখ মিটে গেছে।'

প্রভাসের এসব ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের কথা ভাল লাগছিল না। সে 'মজার' গন্ধ পেয়েছে ভদ্রলোকের আগের কথায়, কৌতূহল উগ্র হয়ে উঠেছে তার।

এবার পূর্ব-প্রসঙ্গের জের টেনে সে বলে বসল, 'এখানে বসে আপনারা বেশ মজা দেখেন মধ্যে মধ্যে—না?'

'মধ্যে মধ্যে! বলেন কি! প্রায়ই দেখি, প্রায় রোজ। নইলে ভাই সত্যিই বলছি, একঘেয়ে এ-কাজ করতে পারতুম না। বারো মাস তিনশো পঁয়ষট্টি দিন, এই গরমে—এঞ্জিনের সামনে বসে সারাদিন গাড়ি চালানো—না, সে সম্ভব নয়। ঐটুকু রস আছে বলেই···'

সূর্য একটুখানি আমার গা টিপে বলল, 'অনেক অবৈধ প্রণয়ের সাক্ষী আপনারা, না? বিলেত হলে ডিভোর্সের মামলার সাক্ষী দিয়ে দু' পয়সা রোজগার হ'ত।'

'এখানেও এক-আধটা যে তেমন অকেশ্যন হয় না, তা নয়। তবে কি জানেন—আমাদের কথাটা কারও মনে পড়ে না। আগেই বলেছি তো, আমাদের মানুষ বলে মনে করে না যে কেউ···নইলে ধরুন না কেন, এই যে সামনে আয়নাটুকু দেখছেন, এতে কত লোকের স্বরূপ যে উদ্‌ঘাটিত হতে দেখেছি! দেশবরেণ্য নেতা, নাম-করা গুরু, সন্ন্যাসী, অধ্যাপক, মাস্টার থেকে শুরু ক'রে স্টুডেন্ট পর্যন্ত। এঁদের অনেকেরই নিজের গাড়ি আছে। কিন্তু গাড়িও যেমন আছে, তেমনি ড্রাইভারও আছে—সে-সব ড্রাইভার সাক্ষী দেয়, গল্প করে, গিন্নীর হয়ে কর্তার ওপর গোয়েন্দাগিরি করে। তাদের সামনে সর্বদা আড়ষ্ট হয়ে থাকতে হয়। কিন্তু ট্যাক্সী-ড্রাইভার তো যন্তর। সব চেয়ে—ওঁরা মনে করেন—এরা কেউ তাদের চিনতে পারবে না।'

একটু থেমে পুনশ্চ নিজেই বলেন, 'অনেকে মনে করে যার গাড়ি আছে সে খুব স্বাধীন—আসলে ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। গাড়ি যার আছে তার মতো পরাধীন খুব অল্পই থাকে। বহু দিক দিয়েই পরাধীন তারা।'

এই বলে আবারও একটু হাসেন ভদ্রলোক। সামনে সি-আই-টি রোডের বাঁকে একটা লরী এড়োভাবে দাঁড়িয়ে আছে—বোধহয় বিগড়েছে, অত রাত্রে কেউ আসবে না ভেবে তারা সেখানেই চট পেতে শুয়ে পড়ে গাড়ি সারাবার ব্যবস্থা করেছে। অসহিষ্ণুভাবে পর পর হর্ন টিপে ভদ্রলোক বললেন, 'যারা নিজেরা গাড়ি চালায়,

তাদের কথা অবিশ্যি আলাদা।' তবে তাও দেখেছি, দেখেছি মানে শুনে বুঝেছি যে, গাড়ি থাকা সত্ত্বেও ট্যাক্সী নিয়ে বেরিয়েছে। ধরুন গভীর রাত্রে হেস্টিংসে কি লেকের ধারে কিংবা ডায়মণ্ডহারবার রোডে একা একটা ছুঁড়িকে নিয়ে যেতে সাহস হয় না। তার চেয়ে একটা ড্রাইভার সঙ্গে থাকে সে ভাল।'

প্রভাস এর মধ্যে আদিরসের গন্ধ পেয়ে উৎসাহিত হয়ে উঠেছে, সে বলে, 'কি করে—মানে কিস-টিস এসব দেখেছেন ?'

'ভারী মজা, না ? নিখরচায় মজা লুটতে চান আমার মুখে গল্প শুনে ? টাকা ছাড়ুন দাদা, এত মজা অমনি হয় না !'

বলে আবার হা-হা ক'রে হাসেন তিনি।

তারপর বলেন, 'কিস-টিস তো তুচ্ছ। ওসব যারা ছেলেমানুষ, ইউনিভার্সিটির সহপাঠিনী নিয়ে ওঠে, কি ছেলেমানুষ প্রাইভেট মাস্টার ছাত্রীকে নিয়ে ওঠে—মানে, যাদের সাহস কম কিংবা প্রেমটা একটু রোমান্টিক—তারা করে। ঝানু যারা—তারা কি ঐতে থামে ভাবেন ?···মশাই, চোখ-কান খোলা রাখলে কী না জানা যায়, আর কী না চোখে পড়ে এই স্টিয়ারিং ধরে বসে থাকলে ! মামা-ভাগ্নী, কাকা-ভাইঝি, আপন ভাই-বোন, দাদু-নাতনী, অনেক দেখেছি, নিত্যই দেখছি। ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান হ'লে এতে ক'রেই বেশ দু' পয়সা রোজগার করে নিতে পারতুম।'

একটু চোখ মটকে দু' আঙুলে টাকা বাজানোর ভঙ্গী করেন ভদ্রলোক।

ঘোড়ার গাড়ি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

কখনও-সখনও—স্টেশনে কি কড়েয়া অঞ্চলে দু' একটা চোখে পড়ে মাত্র।

পুরনো ঝরঝরে ছ্যাকড়া গাড়ি যাকে বলে—কিংবা ফিটনের ধ্বংসাবশেষ।

আমরা কেউ কখনও চড়ি নি।

উনি উত্তর দিলেন, 'ঘোড়ার গাড়ি তো দেখেছেন? ভাড়াটে গাড়ি? যাকে ছ্যাকড়া গাড়ি বলে? আগে ট্যাক্সী আর ক'খানা ছিল—ঘোড়ার গাড়িই বেশি চড়ত লোকে। চারদিকের জানলায় খড়খড়ি ছিল, গাড়িতে চেপে জানলায় খড়খড়িগুলো তুলে দিয়ে ভাবত লোকে খুব নিরাপদ, কেউ দেখতে পাবে না।

'আর তখনকার দিনে একটু পর্দাও ছিল, বহু ভদ্রঘরের মেয়েই গাড়িতে উঠে জানলা তুলে দিতে বলত, রাস্তার লোক চেয়ে দেখবে এটা পছন্দ করত না। শহরের মধ্যে দিনের বেলা খড়খড়ি বন্ধ ক'রে গাড়ি যেতে দেখলে কেউ আশ্চর্য হ'ত না।

'গাড়োয়ানরাও তা জানত। বিশেষ—এসব গাড়ির গাড়োয়ানরা বেশির ভাগই ছিল বিহারী মুসলমান, অশিক্ষিত। এদের দয়ামায়া কম। গাড়িগুলোর এদিকে যেমন জানলা থাকত চারটে, তেমনি সামনেও একটা, কোচবাক্সর নিচে। মানে, যেতে যেতে গাড়ি কোথায় যাচ্ছে সামনের দিকের জানলা তুলে কেউ যদি দেখতে চায় তাদের জন্যে।

'গাড়োয়ানরা করত কি, তার ঐ খড়খড়ির একটা ক'রে পাখী ভেঙে রাখত। অত কেউ লক্ষ্য করত না, গোটা খড়খড়িটাই তোলা আছে, তার মধ্যে ছোট্ট এক টুকরো কাঠ ভাঙা, সেটা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাত না। ওটা যে ইচ্ছে ক'রে ভেঙে রাখা হয়েছে বা ওখান দিয়ে কেউ উঁকি মারতে পারে তাও কারও মাথায় যেত না···

'ও বেটারা করত কি—ওরা গন্ধও পেত খানিকটা, কে কি মতলবে গাড়িতে উঠছে; সে অবিশ্যি আমরাও পাই, গাড়িতে ওঠবার সময়ই টের পাই—খানিকটা পরে পরে ঐ ফুটো দিয়ে উঁকি মারত। ঠিক মওকা বুঝে গাড়ি থামিয়ে নেমে দরজা খুলে বিষম চেঁচামেচি শুরু ক'রে দিত। আমাদের গাড়ি খারাপ ক'রে দিলে, কেউ বলত, বউনি খারাপ করলে, কেউ বলত, এটা আমাদের ব্যবসার গদী, লক্ষ্মীর জায়গা নষ্ট করলে, নোংরা করলে—এই সব।

'কলকাতা শহর জায়গা তো, আগে অবিশ্যি এত ভীড় ছিল না ঠিকই, তবু চেঁচামেচি শুনলে লোক জড়ো হ'তে দেরি লাগত না—দেখতে দেখতে ভীড় জমে যেত। তখন তোর পায়ে পড়ি না তোর গরজের পায়ে পড়ি—ও ব্যাটাদের হাতে-পায়ে ধরে মিটিয়ে নিতে হ'ত। ওরাও মোচড় দিয়ে বেশ কিছু আদায় ক'রে নিত—মক্কেল বুঝে চল্লিশ-পঞ্চাশ পর্যন্ত।

'আবাব কেউ কেউ, আমাদের মতো শান্‌শা গোছের মক্কেল হ'লে, মেয়েটাকেই হাত থেকে একগাছা চুড়ি কি বালা খুলে দিতে হ'ত, কিংবা ছোঁড়াটার গলার বোতাম বা হাতের আংটি। প্রেম করার খেসাবত!'

আবারও শব্দ করে হাসেন ভদ্রলোক।

'তা আপনাদের মধ্যে কেউ কি আব এবকম সুযোগ নেয় না?' মণিময় জিজ্ঞাসা করে।

'নেয় হয়তো।' শুনেছি পাঞ্জাবী ড্রাইভাবরা বেশ ঝোপ বুঝে কোপ মারে। আমরা পারি না।'

এই সময় কথায় একটা ছেদ পড়ল।

হঠাৎ অত রাত্রেও পাশেব গলি থেকে একটা রিক্সা বেরিয়ে আসছিল সবেগে—তাকে বাঁচাতে বেশ একটু কসরৎ করতে হ'ল ভদ্রলোককে।

তাকে বাঁচিয়ে গাড়ি আবার স্বচ্ছন্দ হ'লে পূর্ব-প্রসঙ্গের জের ধরেই বললেন, 'আর, এখন যা হয়েছে এসব করতে গেলে ট্যাক্সীর ভাড়াটে জোটাই ভার হবে। শ্যামবাজার থেকে এসপ্ল্যানেড, আর পূর্ণ থিয়েটার থেকে গড়িয়াহাট মানে আপিসের যাত্রী আর সিনেমার যাত্রী—এতে ক'রে কত হয় বলুন?

'যারা "রস" করতে ওঠে তারাই বেপরোয়া, বালিগঞ্জ থেকে উঠে হয়তো বললে মোমিনপুর হয়ে গঙ্গার ধারে চলুন, কেউ হয়তো বললে শ্যামবাজার থেকে উঠে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের চারদিকে আস্তে

গেছে—কেন, কি জন্যে কাঁদছেন এত, মেয়েটাকে গলাতে, আগেই বুঝে নিয়েছি।

'তাছাড়া উঠেই ফরমাশ করলেন—ডায়মণ্ডহারবার রোড ধরে চল, কতকটা নিরুদ্দেশ যাত্রার মতো।

'রাগ হয়ে গেল খুব ভাই, বুঝলেন, কচি মেয়েটা, বোধহয় হার্ডলি একুশ বছর বয়েস হবে, প্রোফেসাব কম হ'লেও বাহান্ন-তিপ্পান্ন, সুপুরুষ বলে অনেকেই—মানে, রঙটা ফরসা, মেয়েলি মেয়েলি চেহারা, সরু মিহি গলা, সবটাই মেয়েছেলের মতো, কী দেখে যে পছন্দ করে—সুপুরুষ বলে, ঈশ্বর জানেন।

···'সে যাকগে মরুকগে—মেয়েটার যে বাপের বয়িসী তাতে তো কোন সন্দেহ নেই···মেয়েটাকে নষ্ট করবার তালেই এত আয়োজন পষ্ট বুঝতে পারলুম, তাই আয়নাটাও এমনভাবে য়্যাডজাস্ট ক'রে নিলুম যাতে বাইরের রাস্তা নয় গাড়িব ভেতরের ছবিই দেখা যায়। ওসব নির্জন রাস্তা, সন্ধ্যে হয়ে এসেছে তখন—পাশের রাস্তায় কী আসছে দেখার বিশেষ দরকার নেই।

'ও মশাই, যা ভেবেছি তাই।

'হঠাৎ দেখি কথাবার্তা বন্ধ হয়ে এল। আয়নার দিকে চেয়ে দেখি তখন চুমু খাবার পালা চলেছে, মেয়েটা এলিয়ে পড়েছে একেবারে—মনে হচ্ছে স্বর্গই বুঝি পেয়ে গেছে হাতের মধ্যে। তার পর এক সময় দেখি চুমু খাবার শব্দও নেই। আয়নায় আড়ে চেয়েই দেখতে পেলুম কারণটা। ব্যস, আর পায় কে। গাড়ি থামিয়ে নেমে এসে গম্ভীর-ভাবে বললুম, 'আমি কিন্তু সোজা এখান থেকে থানায় নিয়ে যাচ্ছি—আমাদের এই আইন—আমাকে দোষ দেবেন না।

'ওঃ, সে কী মজা মশাই কি বলব, ফুর্তি তো রগে উঠে গেছে ততক্ষণে—মেয়েটা তো কেঁদেই ফেললে, লোকটা এসে একেবারে পায়ে পড়ল। একবার এ পায়ে ধরে তো আর একবার ও পায়ে ধরে। তবে আমারও তখন মেজাজ চড়ে গেছে—কান্নাকাটিতে

ভেজবার মুড নেই, করকরে পঞ্চাশটি টাকা গুনে নিয়ে মোমিনপুরের মোড়ে এসে ভাড়া গুনে নিয়ে নামিয়ে দিলুম। বললুম, "ঢের ট্যাক্সী পাবে এখানে, নেমে যাও, আমি আর এ পাপ বইতে পারব না। কালীঘাটে গিয়ে গাড়ির মধ্যে গঙ্গাজল দিয়ে তবে অন্য প্যাসেঞ্জার তুলব।" তা তারাও তখন নামতে পারলে বাঁচে—বিনা বাক্যব্যয়ে নেমে গেল।'

॥ তিন ॥

'তা এরকম হাশ-মানি আর কখনও নেন নি এর মধ্যে ?' মণিময় জিজ্ঞাসা করল।'

'ন্-না। মানে—স্টিয়ারিং ধরে মিথ্যে কথা বলব না, আর একবার নিয়েছিলুম, কিন্তু ভোগে আসে নি।'

'তার মানে ?'

'সে অনেক কথা।' বলে একটু চুপ ক'রে রইলেন ভদ্রলোক।

মনে হ'ল বলবেন না ব্যাপারটা, বলতে পারবেন না, বলার কিছু বাধা আছে।

কিন্তু নিজেই আবার শুরু করলেন, মিনিট খানেক পরেই।

'সেদিন সেন্ট্রাল ক্যালকাটা অন্ধকার—তিনঘণ্টা ইলেক্ট্রিক ছিল না। তার মধ্যেই প্যাসেঞ্জার উঠল, স্মার্ট ইয়ংম্যান একজন আর একটি মেয়ে। লোকটা উঠতেই টের পেলুম মদের গন্ধ—তখনই সন্দেহ হয়েছিল—উঠে বললেন, "এই অন্ধকারের মধ্যেই ঘোরো, আমরা কলকাতার এই অন্ধকার চেহারাটাই দেখতে চাই। নেভার মাইণ্ড্ দ্য এক্স্পেন্স, খরচা যা লাগে দেব।" বুঝলুম ব্যাপারটা, তবু, শ্রাদ্ধটা কতদূর গড়ায় দেখার জন্যেই আরও, সেই মতোই ঘুরতে লাগলুম।

'ধর্মতলার মোড়, চৌরঙ্গীর খানিকটা, এদিকে ওয়েলিংটন স্কোয়ার, সব অন্ধকার। অসুবিধে কি কম—সন্ধ্যের রাশ, রাস্তায় আলো থাক আর না থাক ট্রাফিক তো কম নয়, অন্ধকারে চালানো প্রাণ হাতে ক'রে।

'তা মশাই রাস্তায় আলো না থাক, এক-আধবার অন্য গাড়ির হেডলাইট তো এসে পড়ছে মধ্যে মধ্যে, তাতে ভেতরের ছায়া আয়নায় দেখার কোন অসুবিধে নেই।

'যখন দেখলুম ঠিক সময়টি এসেছে—সোজা স্পীড দিয়ে একেবারে হেয়ার স্ট্রীট থানার সামনে নিয়ে এলুম। ও ব্যাটারও ততক্ষণে নেশা ছুটে গেছে, ব্যাপারটা বুঝে, "ওকি ওকি, কোথা যাচ্ছ কোথা যাচ্ছ" বলে সোজা হয়ে বসেছে। আমি ঠিক থানার দরজায় নয়, সুযোগও হয়ে গেল একটা—থানার সামনে ছুটো পুলিস-ভ্যান দাঁড়িয়ে ছিল, একটু এদিক ক'রে দাঁড় করিয়ে দিলুম, বললুম, "নামুন—থানায় যেতে হবে আমার সঙ্গে। আমাদের এই আইন। যদি না যান এখান থেকে চেঁচিয়ে পুলিস ডাকব।"

'তার পর যা হয় এসব ক্ষেত্রে, হাতে-পায়ে পড়াপড়ি একেবারে। ...তবে এখানে একটু বিশেষ ছিল, হাতে-পায়ে ধরছিল শুধুই পুরুষটা —মেয়েটা গাড়ির মধ্যেই কাঠ হয়ে বসে ছিল। তবে এবার পথের আলো এসে পড়েছিল, মেয়েটাকে দেখতে কোন অসুবিধে হয় নি।

'তা দিলে, লোকটা গুনে গুনে সত্তর টাকাই বার ক'রে দিলে। বললে আর তার কাছে কিছু নেই, খুচরো ছুটো টাকা ছাড়া, তাকে ইটিলীতে যেতে হবে, রিক্সা ক'রে গেলেও ছুটো টাকা লাগাবে।...

'যাই হোক, টাকাটা নিয়ে বললুম, "আপনি চলে যান, ওকে আমি ধর্মতলার মোড়ে গিয়ে নামিয়ে দেব।"

'সে তখন পালাতে পারলে বাঁচে, একথা তার একবারও মনে এল না যে, আমাকে চ্যালেঞ্জ করে যে, আমার ওপরই বা কি বিশ্বাসে মেয়ে-ছেলেটাকে সে ছেড়ে দিয়ে যাবে! মেয়েটাও কোন আপত্তি করল না। তেমনি আড়ষ্ট কাঠ হয়ে বসে রইল।

'ধর্মতলার মোড়ে এনে, তখন আলো জ্বলে গেছে, নামিয়ে দিয়ে সেই সত্তরটা টাকা ওর হাতে দিয়ে দিলুম।

'ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিছল সে প্রথমটা, বোধ হয় ভেবেছিল এটা দিয়ে তাকে কোন নতুন বিপদে ফেলতে চাইছি, হয়তো চুরির দায়েই ফেলব।

'ভয়ে কিছু বলতেও পারছে না—শুধু মুখটা ছাইয়ের মতো সাদা

হয়ে গেছে, আর হাতটা কাঁপছে টাকাটা ধরে, এতেই বুঝলুম, বললুম, "ভয় নেই, এ পাপের টাকা ঘরে তুলব বলে নিই নি। এ তোমার জন্যেই নেওয়া। টাকার জন্যেই তো ঐ পশুটার সঙ্গে ঘুরছিলে। এত টাকা সে দিত না, পাঁচ-দশটাকা দিয়ে পথেই ছেড়ে দিত আবার। এ সব টাকাটাই দিচ্ছি, বাসায় চলে যাও, ক'দিন বিশ্রাম করো—নইলে এ চেহারা ভাঙিয়ে টাকা রোজগারের মতো অবস্থা আর বেশি দিন থাকবে না তোমার"।'

সূর্য প্রশ্ন করল, 'টাকার জন্যেই এ কাজ করতে এসেছিল কী করে জানলেন আপনি?'

খানিকটা চুপ ক'রে রইলেন ভদ্রলোক।

তার পর বললেন, 'এসব আমরা মুখ দেখলেই চিনতে পারি, যে-সব মেয়েরা ভদ্দরঘরের মেয়ে সেজে এমনি পথে-ঘাটে খান্‌কিগিরি ক'রে বেড়া। তাদের স্বাস্থ্য নাম-লেখানো খান্‌কিদের চেয়েও খারাপ হয়ে যায়। তাছাড়া স্টিয়ারিং হাতে মিছে বলব না, মেয়েটা আমার চেনা, আগে দেখি নি তাই অন্ধকারে ভাড়া তুলেছি—নইলে দেখলে ওকে গাড়িতে তুলতুম না।'

আর কিছু বললেন না ভদ্রলোক, দেখলুম কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেলেন অকস্মাৎ।

মনে হ'ল হয়তো বা কোন ব্যথার জায়গায় ঘা পড়েছে।

একটু পরে প্রভাস একটা সিগারেট বার ক'রে বলল, 'খাবেন একটা সিগারেট? খান আপনি?'

'বিলক্ষণ। খাই না তো কি! কিসের জোরে যুঝব বলুন! মদ খাই না—আবার সিগারেটও যদি না খাই...'

সিগারেটটা পেয়ে ভদ্রলোক আবার যেন পূর্ব সত্তায় ফিলে এলেন।

মিনিটখানেক নিঃশব্দে ধোঁয়া টানার পর দু'আঙুলে ক'রে সিগারেটটা ধরে বললেন, 'তবে উল্টোটাও আছে। একবার

একটা মেয়ের ভাল করতে গিয়ে কি বিপদেই যে পড়েছিলুম কী বলব।'

'কী রকম। কী রকম।' আমরা সকলেই কৌতূহল প্রকাশ করি।

'সে ভাই বেশ কিছুদিন আগের কথা। তখনও বিধান রায় বেঁচে। আমি সবে ট্যাক্সী চালাতে শুরু করেছি, নিজের গাড়ি তখন—বিধান-বাবুই শিক্ষিত বেকার বাঙালী ছেলেদের ট্যাক্সী দেবার ব্যবস্থা করেছেন, সেই সূত্রেই ট্যাক্সী পাওয়া। তখন রোজগারও ছিল ঢের।

'পুজোর সময় প্যাণ্ডালে প্যাণ্ডালে মেয়েদের ভীড় ক'রে ঠাকুর দেখে বেড়াবার ব্যাপার তো জানেন, ইদানীং চারদিকে এত গণ্ডগোল বোমাবাজি গুলি হাঙ্গামা—তাতে একটু কমেছে—তবু বাগবাজারে কুমোরটুলিতে কি ওদিকে ভবানীপুরে তেইশপল্লী না কি বলে—ভীড় কি আর কম হয়? বিশেষ মেয়েদের। ব্যাপার-গতিক দেখে মনে হয় ওরা সাধ ক'রেই বিপদে পড়তে আসে।

'আমি যে সময়ের কথা বলছি সে সময় তো আরও—অষ্টমী-নবমীর রাত্তিরে গাড়ি-ঘোড়া সব জ্যাম হয়ে যেত—সমস্ত পথ পুজোতলা সব মনে হ'ত মানুষ—না, থুড়ি, মেয়েমানুষের সমুদ্র হয়ে গেছে। পুরুষ বলতে ঐ মেয়েদের সঙ্গে যারা আসত, আর যে-সব ছোঁড়ারা মেয়ে দেখতে বেরোয় তারা। ওরা চার কালই আছে, চার কালই থাকবে। আজকাল শুনেছি পুজোর আগে পুলিস কতক কতক আটকায়, ধরপাকড় করে, তখন অত ছিল না। অবশ্য তখন এতটা বাড়াবাড়িও ছিল না বোধ হয়।

'এর মধ্যে দুটো-চারটে মেয়ে এদিক-ওদিক হবে, এ তো জানা কথাই।

'কেউ কেউ অবিশ্যি, ঐ যা বললুম, সাধ ক'রেই মরতে যায়।

'কেউ কেউ ন্যাকাও আছে।

'আমি যে মেয়েটার কথা বলছি সে এই দলের। তার কথা আর

বলি কেন, ন্যাকা তার মা-ই। বালিগঞ্জের বেশ অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে, পরিচয় দিলে হয়তো চেনাও বেরিয়ে যাবে আপনাদের কারও সঙ্গে, ফুটফুটে দেখতে। ষোল বছর বয়স হবে কি বড় জোর সতেরো—সবে নাকি ইস্কুলের পড়া শেষ করেছে। তাকে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে অমনি—হেঁটে—গাড়ি তো চলবে না সে ভিড়ে—কুমোরটুলি না কোথায় যাচ্ছিল, বোধ হয় সিমলে থেকে, গুণ্ডারা হাত সাফাই করে। ছ্যাখ ছ্যাখ করতে কবতে মুখ চেপে নিয়ে চলে যায়—কেউ কোন বাধা দেবার আগেই।

'এ সবই আমার শোনা কথা অবিশ্যি, পবে ওদের কথাবার্তা থেকে যা বুঝেছিলুম।

'তার পব কোথায় নিয়ে গিয়ে কি কবেছে জানি না—আমি মশাই পুজোব বাজারে রাত্রে বেরিয়েছি—টাকা রোজগার করতে যত না হোক মজা দেখতেই—ভিড়ের জন্যে বেশির ভাগ রাস্তাতেই তো গাড়ি চালানো যায় না, চিৎপুবই ধরুন না কেন, একবার একমুখো ঢুকলে রাস্তা শেষ হ'তে পুরো তিন ঘণ্টা—কাজেই ও চেষ্টাই করি না, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কি সার্কুলার রোড, এর মধ্যেই থাকি। নবমীর শেষরাত্রেও তাই আসছি দমদমে এক প্যাসেঞ্জার নামিয়ে দিয়ে, সার্কুলার রোড দিয়েই আসছি, ফড়েপুকুর ছাড়িয়ে একটু আসতেই পথের মধ্যে প্যাসেঞ্জার হাত দেখাল।

'দুটি ছোকরা, ও একটি মেয়ে। মেয়েটাকে ধরে আছে একজন, মনে হ'ল মেয়েটা বোধহয় টলছে।

'একবার ভাবলুম চলে যাই। অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে—বিশেষ ক'রে মেয়েছেলেকে মদ খেতে দেখলে কেমন যেন ঘেন্না করে বুঝলেন, আমার মনে হ'ল মেয়েটাকে নিয়ে ঠাকুর দেখার নাম ক'রে বেরিয়েছিল, তারপর কোথাও বসে মদ গিলেছে—মেয়েটাকেও গিলিয়েছে, ওটার—অভ্যেস নেই—বেহেড হয়ে পড়েছে।

'কিন্তু এসব লক্ষ্য করেছি তো কাছে এসে, গাড়িও দাঁড় করিয়েছি,

যদিও স্টার্ট বন্ধ করি নি—মন ঠিক করতে করতেই এক ছোকরা গাড়ির দোর খুলে মেয়েটাকে বসিয়ে দিয়েছে, তার পর একখানা পাঁচ টাকার নোট গুলি পাকিয়ে আমার কোলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে, "যেখানে নামাতে বলে নামিয়ে দিও।" আমি বলতে যাচ্ছি এসব পারব না—আরেক ছোকরা "চোপ্!" বলেই এতবড় এক ছোরা বার করেছে, "খবরদার! একটি কথা বলবে না, যা বললুম ভাল চাও তো তাই করো। যদি এদিক-ওদিক করেছ, গাড়ির নম্বর দেখে রাখলুম সাবাড় ক'রে দেব একেবারে!"

'বুঝুন ব্যাপার। ছোঁড়াগুলোর যা চোখ-মুখের ভঙ্গী—ছুরি চালিয়ে দেওয়াও আশ্চর্য নয় কিছু—এক মিনিটের ব্যাপার।

'অগত্যা তখন তো গাড়ি চালিয়ে এগিয়ে এসে প্রাণ বাঁচাই! এলুমও তাই। তার পর হোগলকুঁড়ের কাছাকাছি এসে জিজ্ঞেস করলুম মেয়েটাকে ঠিকানা—মেয়েটা বিড়-বিড় ক'রে বললেও, ভাগ্যিস তখনই শুনে নিয়েছিলুম—তারপর যত কথা বলি, না রাম না গঙ্গা।

'তখন গাড়ি থামিয়ে নেমে কাছে গিয়ে দেখি—মদ নয়, মদের গন্ধ কোথায় যাবে, এ অন্য ব্যাপার। একেবারে বেহুঁশ। আর একটু ঠাউরে দেখি—কী সর্বনাশ, এ যে রক্তে ভাসছে। আমার নতুন গাড়ি, সীটের ওপর নতুন খাকির পোশাক পরিয়েছি, সে একেবারে বরবাদ হয়ে গেছে, রক্তে লাল!

'একবার মনে করলুম পথের ধারে নামিয়ে দিই কোথাও, গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যাই।

'সেইটেই স্বাভাবিক—মনে করাটা। হ্যাঙ্গামা-হুজ্জুতকে কে না ভয় করে বলুন?

'অন্তত আমি চিরকাল ও জিনিসটাকে এড়িয়ে যাওয়ারই চেষ্টা করেছি।

'তার পর মাথা ঠাণ্ডা ক'রে ভাবলুম, এ নিয়ে তো শোরগোল

একটা হবেই, আমারও এখন গিয়ে এই গাড়ি সাফ করতে, সীটের কভার কাচতে খানিকটা লোক-জানাজানি হবেই—আর ও মশাই দু'জন-একজন জানলেই কথা হাতের বাইরে চলে গেল জানবেন, তা কে জানে ঘরের লোক আর কে জানে আত্মীয়!

'শেষে আমাকেই হয়তো খুনের দায়ে চালান দেবে, তখন কিছু বলতেও পারব না, কোন জবাবদিহি করতে পারব না। মেয়েটা মরে গেছে কিনা তাই বা কে জানে, মনে তো হচ্ছে এখনও মরে নি, কিন্তু পথে নামিয়ে দিলে যদি মরে যায়—তখন তো সোজাসুজি খুনের চার্জ!

'অনেক ভাবলুম, বুঝলেন। মনে হ'ল একবার হাসপাতালেই নিয়ে যাই, তাতে মেয়েটার বাঁচার চান্স বেশি। কিন্তু সেও ধরুন থানা-পুলিসের হাঙ্গামে পড়ব। সহজে ছাড়বে না। কী ব্যাপার, কী হয়েছে কিছুই জানি না। অথচ সেকথা কেউ বিশ্বাসও করবে না—মাঝখান থেকে লাঞ্ছনার শেষ থাকবে না। বিজয়া-দশমীর দিনটা মাটি, এক পয়সা আয় হবে না, হয়তো সারাদিন হাজতে কাটাতে হবে।

'তাছাড়া দুর্নাম তো আছেই, আত্মীয়দেরই বিশ্বাস করাতে পারব না হয়তো যে, আমি এ বিষয়ে নির্দোষ। চিবদিনের মতো একটা ছাপ পড়ে যাবে নামে।

'নাঃ, তার দরকার নেই···ঠিক করলুম। সোজাসুজিই চলব, ভাড়া দিয়েছে, ঠিকানা দিয়ে দিয়েছে—যেখানে পৌঁছে দেবার কথা সেখানেই দেব, তার পর যা অদৃষ্টে আছে হবে।

'সত্যি কথার মার নেই—এ আমি চিরদিনই দেখেছি।

'একটা মিথ্যে হাজারটা মিথ্যেকে টেনে আনে—তখন আর কুল-কিনারা পাওয়া যায় না কোথাও।

'এইসব ভেবে সোজা বালিগঞ্জের দিকেই গাড়ি চালালুম। ঠিকানাটা মনে ছিল, খুঁজেও পেলুম। বেশ ভাল বাড়ি, বড় রাস্তার

ধারেই। খুব বড়লোক না হ'লেও অবস্থাপন্ন লোক, পরে পরিচয় পেয়েছিলুম—নাম-করা লোকেরই মেয়ে।

'ও মশাই, পৌঁছলুম তো, তার পর কি ফৈজৎ! ছাড়ে না আমাকে, বলে, "পুলিসে দোব, তুমিও নিশ্চয় ঐ দলে ছিলে, এখন বেগতিক দেখে ফিরিয়ে দিতে এসেছ।" যত বলি বেগতিকটা কিসের, সে রকম বুঝলে পথে ফেলেই তো পালাতে পারতুম। এ মুর্দো গাড়িতে তুলে এতটাকা দামের সীট-কভার নষ্ট করি কেন—এখন এই বছরকার দিনে একবেলা লাগবে আমার এই গাড়ি পোষ্কার করতে ·· তা কে কার কড়ি ধারে! বলে, "তুমি মহা শয়তান, পাছে পরে কোন ঝামেলায় পড় তাই এখন ভালমানুষ সাজতে নিয়ে এসেছ। বজ্জাতিকে বজ্জাতিও করলে, আবার এদিক থেকেও বকশিশ খাবার তালে আছ।"

'আটকেই রাখলে মশাই—সারাটা সকাল। তখনই পুলিস ডাকত, মেয়ের বাপ তো ক্ষেপেই উঠেছিল, জ্যাঠা বড় ডাক্তার—দেখলুম তারই মাথা ঠাণ্ডা, সে ভাইকে ডেকে বললে, "এখনই এত গোলমাল লোক-জানাজানি করার কি আছে, দেখি না মেয়েটার অবস্থা—যদি খুকুর জ্ঞান হয় এর মধ্যে, ওকেই জিজ্ঞাসা করলে তো হবে। ঠিকানাটা তো ও-ই দিয়েছে, গাড়িতে ওঠার সময় পর্যন্ত জ্ঞান ছিল নিশ্চয়ই।"

'খুব যে ভরসা পেলুম তা নয়। মেয়েটার যা অবস্থা—বেহুঁশ মড়ার মতো তো নামালে গাড়ি থেকে—জ্ঞান যে আদৌ হবে তা মনে হয় না। তবু, কী আর করি, মা দুর্গার ওপর বরাত দিয়ে চুপ করে বসে রইলুম। অন্যায় যে করি নি তা আর কেউ না জানুক, মা জানেন। কিন্তু তখন অবস্থা খুব কাহিল, দারোয়ান পাহারা দিচ্ছে, বেরিয়ে এক পেয়ালা চা খাব তার উপায় নেই। মনে মনে ভাবছি, উঃ, খুব রোজগার করতে বেরিয়ে ছিলুম বাবা! কার মুখ দেখে যে উঠেছিলুম! এমন উটকো আপদে জীবনে কখনও পড়ি নি। আর

কেউ পড়েছে বলেও শুনি নি তখনও পর্যন্ত। হাতে দড়ি পড়বে কি গলায়—এই ভেবেই গলা শুকিয়ে কাঠ!

'যাই হোক, জ্যাঠা—আগেই বলেছি খুব নাম-করা ডাক্তার—নিজেই দরজা বন্ধ ক'রে কী সব করলে—বারান্দা দিয়ে যা ছুটোছুটি, মনে হ'ল অপারেশন-টপারেশন বা ঐ রকম কিছু হ'ল—হয়তো স্টিচ্ করারই দরকার, কে জানে—পুরো দুটি ঘণ্টা কাটবার পর মেয়েটার নাকি হুঁশ হয়েছিল একবার, তখনই বোধ হয় বলে থাকবে যে, পথের চলতি ট্যাক্সী ডেকে উঠিয়ে দিয়েছে গুণ্ডাগুলো—তখন আমার ওপর দয়া হ'ল, আমি হুকুম পেলুম এবার চলে যেতে পারি।···

'তখন বেলা ন'টা বাজে—পেটে একটু চা নেই, খাবার নেই—লাঞ্ছনা-গঞ্জনার তো শেষ ছিল না সারাটা ক্ষণ, গাড়ির কভার শুকিয়ে উঠেছে—পঞ্চাশ-ষাট টাকার জলাঞ্জলি—বেরোবার সময় বাপটা দশটা টাকা দিতে এসেছে, আমার তখন বুঝলেন ভাই, রাগে ব্রহ্মাণ্ড জ্বলছে মাথার মধ্যে—নোটখানা দুম্‌ড়ে লোকটার মুখের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গাড়ি চালিয়ে চলে এলুম। চেঁচিয়ে বলে এলুম, "সেই সময় নামিয়ে পথের ধারে মেয়েটাকে ফেলে দিলেই ঠিক হ'ত— মরে পড়ে থাকত, শ্যাল-কুকুরে খেত—কিংবা পুলিসে উঠিয়ে নিয়ে জানাজানি হ'ত, খবরের কাগজে লেখালেখি, সে-ই ঠিক হ'ত। এই শিক্ষা হয়ে গেল, ভালমানুষী আর কখনও করব না।···ডবকা মেয়ে নিয়ে নিজেরা এই ভীড়ে জেনেশুনে ফিরি করতে বেরোবেন, আর একটা কিছু হয়ে গেলে আমাদের মতো গরীব লোকেদের ওপর জুলুমবাজি! ছোঃ! ঘেন্না হয়ে গেল লেখাপড়া-জানা বড়লোক ভদ্দরলোকে!"

'খুব বলেছিলুম ভাই--মনের যত ঝাল ছিল ঝেড়ে এসেছিলুম। টাকা তো গেছেই—লোকসান যা হবার তা তো হয়েছেই—অত কিসের আর ভদ্রতা তখন!'

॥ চার ॥

এর ভেতরেই আমরা গন্তব্যস্থানে পৌঁছে গেছি অনেকক্ষণ, শেষের দিকে গল্পটা চলছিল এঞ্জিন বন্ধ ক'বে রেখেই।

এবার ভাড়া চুকিয়ে নেমে যাবার পালা।

তুই নয়—প্রভাস আমাদেব দলের ক্যাশিয়ার, একটা টাকাই বেশি দিতে গেল—ভদ্রলোক নিলেন না।

বললেন, 'না মশাই, অনেকদিন পরে মনের মতো প্যাসেঞ্জার পেয়েছি, মনটা খুশি আছে। টাকা তো দেখেছি, হক্কের পাওনা ছাড়া বেশি নিতে গেলেই তার চারগুণো বেরিয়ে যায়। ও থাক।'

খুশি হয়েছিলুম আমরাও।

ট্যাক্সী তো প্রায় প্রত্যহই চাপি, এমন শিক্ষিত রসিক ড্রাইভার কদাচিত মেলে।

তাই আমিই বললুম, 'আপনি—ওদিক দিয়ে কোনদিন গেলে মানে কলেজ স্ট্রীট পাড়ায়—একটু খোঁজ করবেন।'

'আপনারা কি রোজই এই সময় ফেরেন ?—ট্যাক্সীতেই ?'

'ঠিক যে রোজই একসময় ফিরি, তা নয়। এক-আধদিন আগেও হয়—তু'একদিন হয়তো রাত দশটাও হয়ে পড়ে—তবে সে তু'এক-দিনই! বেশির ভাগই এই সময়।'

'ঠিক আছে, পারি তো ঢুঁ মারব ওখানে। তবে আমাদের বুঝছেন তো—কোন কিছুরই ঠিক নেই। কোথায় কোন্ দিন গিয়ে পড়ব তা কেউ বলতে পারে না। ওদিকে ডায়মণ্ডহারবার থেকে এদিকে বর্ধমান পর্যন্ত—এরিয়া তো কম নয়। আচ্ছা আসি, নমস্কার।'

প্রভাস কৃতজ্ঞচিত্তে আর একটা দমকা খরচ ক'রে বসল, আর একটা সিগারেট বার ক'রে দিল।

'চলবে ?'

'ও, মেনি থ্যাঙ্কস্। দামী সিগারেট—এ আর কিনে খাবার তো ক্ষমতা হয় না। আমাদের যা করে ঐ কুড়ি পয়সা প্যাকেট।'

দীপু এতক্ষণ চুপ করে ছিল, বলল, 'আপনার নামটা তো জানা হল না!'

'নাম ?' সিগারেটটায় প্রথম লম্বা টান দিয়ে বললেন, 'নাম আর শুনে কি করবেন! কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন। একটা কুঁড়েঘরও নেই কোথাও—নাম অবনীকান্ত। অবনীকান্ত চক্রবর্তী। আচ্ছা—চলি এখন।'

পরের দিন আর পেলুম না ভদ্রলোককে।

মনটা চাইছিল অবনীবাবুকে পেলে ভাল হয়—তাড়াহুড়ো ক'রে ন'টার মধ্যেই কাজ সেরে বেরিয়ে ঝাড়া দশটি মিনিট দাঁড়িয়ে রইলুম, কিন্তু অবনীবাবুর চিহ্নও চোখে পড়ল না।

বুঝলুম দূর-পাল্লা কোথাও গিয়ে পড়েছেন। নইলে কাল যা ভাব দেখেছি শুধু যে আমরা মজেছি তাই নয়—ভদ্রলোক নিজেও মজেছেন আমাদের সাহচর্যে।

তার পরের দিন বেরোতে একটু দেরিই হয়ে গিছল—যখন বেরিয়েছি তখন সওয়া ন'টাও বেজে গেছে, ন'টা কুড়ি কি বাইশ হবে—কিন্তু বেরিয়েই দেখি অবনীবাবুর গাড়ি স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে আছে।

উৎসাহিত হয়ে কাছে যেতেই বলে উঠলেন, 'লেট্, ভেরি লেট্ আমি ঠিক ন'টার সময় এসেছি। এর মধ্যে তিনটে ফেয়ার ছেড়েছি আপনাদের জন্যে। এই শেষ সিগারেট প্যাকেটের, ভেবে রেখেছিলুম এটা শেষ হ'লেই চলে যাব। নিন, উঠুন।'

'কাল আমরা আপনার আশায় ন'টার আগেই বেরিয়ে পড়েছিলুম।' সূর্য বলল।

'সে আমিও ভেবেছি। কিন্তু এত দূরে গিয়ে পড়লুম—সেই সোদ-

পুর, ঘোলায়। যাব না কিছুতে, ডবল ভাড়া কবুল ক'রে নিয়ে গেল
এই দিনকাল, পথঘাটের যা অবস্থা ঠাকুর ঠাকুর করতে করতে
যাওয়া—। ঠিক টাকার লোভে যে যাওয়া তা নয়, ওদিকে হাওড়ার
ট্রেন লেট্, ভেস্টিবুল পৌঁচেছে রাত আটটায়, ভদ্রলোকেরা স্ট্র্যাণ্ডেড
হয়ে পড়েছেন, কেউ যেতে চায় না, সঙ্গে একটা অল্পবয়সী মেয়ে তার
মাস-খানেকের বাচ্চা—প্রায় কান্নাকাটি করতে লাগলেন ভদ্রলোকরা
—কী করি, যা থাকে কপালে বলে তুলে নিলাম। তা অন্য কিছু
হয় নি—শ্যামবাজারের কাছে এসে টায়ার গেল একটা, নেমে বদলাতে
বদলাতে দশটা বেজে গেল। নিন, উঠে পড়ুন। আজ সারাদিন
খুব খাটুনি গেছে, আপনাদের নামিয়ে সিধে বাড়ি ফিরে যাব—'

গাড়িতে উঠতেই একটা কি বিশ্রী গন্ধ নাকে গেল। খুব যে চড়া
তা নয়—তবু বেশ কটু গন্ধ।

মুহূর্ত কয়েকের মধ্যেই চিনতে পারলুম খুশবুটা—মদের গন্ধ।

পেলুম আমরা সকলেই।

আর এক্ষেত্রে সন্দেহটা যেদিকে যাবার কথা সেই দিকেই গেল।
দাদা আমার 'মালদার' দেখছি। যা ফুর্তিবাজ—মালদার না হওয়াই
আশ্চর্য।

কিন্তু অবনীবাবু যেন মনে হ'ল—আমাদের মনের কথাটা, সেই
সেকালের জিপসীদের ক্রিস্টাল বলের লেখার মতো, পরিষ্কার পড়তে
পারলেন।

বললেন, 'উঁহু, উঁহু—আমি নয় আমি নয়। মুখ শুঁকে দেখতে
পারেন।···এতকাল এই লাইনে আছি—জীবনে গোনা দু'তিনদিনের
বেশি ও জিনিস টাচ্ করি নি। তাও, নেহাতই কৌতূহলে পড়ে।
নইলে উপরোধে পড়ে খেতে গেলে এতদিনে পাঁড় মাতাল হয়ে যেতুম।
খাওয়ানোর লোক ঢের।···ও আমার ভালও লাগে না। আসলে
এক বেটা মাতাল উঠেছিল গাড়িতে, এই সবে নামিয়ে দিয়ে আসছি
ফ্রী স্কুল স্ট্রীটে—তারই খুশবু এখনো কাটে নি।'

তার পর গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বললেন, 'কম জ্বালান জ্বালিয়েছে বেটা! মিটারে উঠল চার টাকা নব্বুই পয়সা, পাঁচ টাকার নোট একখানা বার ক'রে দিলে। দশপয়সার চেঞ্জ, মাতাল কেন—বেশির ভাগ সহজ মানুষই ফেরত নেয় না। মাতালরা এসব ক্ষেত্রে দশ-টাকার তো দূরের কথা, শুনেছি একশো টাকার নোট ফেলে দিয়ে চলে যায়—ফেরত পয়সার কথা মনেও পড়ে না। এ বেটা, ছোকরা মাতাল কিনা, পয়সার জ্ঞান টনটনে—এদিকে দিব্যি টেরিলিনের জামা-প্যাণ্ট—শার্টে খানিকটা মদ পড়েছে, বোধ হয় সেই জন্যেই এখনও গাড়িতে গন্ধ—নোটটা হাতে দিয়ে বললে, "চেঞ্জ?"

'আমার ভাই মহা বাগ হয়ে গেল। একে তো মদের গন্ধে মাথা ধরে উঠেছে, তায় কোথা দু'পয়সা বেশি দেবে না দশ নয়া পয়সা ফেরত চায়! ছিল কাছে, বললুম নেই।

'বেটা তেবিয়া হয়ে উঠল একে বাবে! বলে, "উঁঃ, ভেবেছ মাতাল—ঠকিয়ে বেশি নেবে। মদ খেয়েছি বটে, তাই বলে তো আর বেহেড হই নি। বেশি দোব কেন?" আমিও চোটপাট শুরু করলুম, বললুম, "বেশি কে চাইছে—আমার পাওনা দিয়ে দিন আমি চলে যাই। আমাকে একজ্যাক্‌ট্‌ ভাড়া দেবাব কথা আপনার, আমি চেঞ্জ দিতে বাধ্য নই আপনাকে।"

'বেটা এবার একটু দমে গেল, বুঝলেন। চোখ পিটপিট ক'রে খানিকটা আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে তড়াক ক'রে গাড়ি থেকে নেমে গেল। সামনেই একটা পানের দোকান, সেখানে গিয়ে কিনবি তো কেন একেবারে এক প্যাকেট রিজেণ্ট সিগারেট। দশটাকার নোট ভাঙিয়ে সিগারেটের দাম চুকিয়ে দিয়ে পান-আলাকে বলে খুচরো পয়সা নিলে এককাঁড়ি—তারপর আমার কাছে এসে সাবধানে দু'বার তিনবার ক'রে গুনে চার টাকা নব্বুই নয়া পয়সা বুঝিয়ে দিলে।

'দিলে তো দিলে, আমিও ভাড়া বুঝে পেয়ে গাড়ি ছাড়তে যাচ্ছি—মিটারের ফ্ল্যাগ সিধে ক'রে—প্রচণ্ড এক ধমক, "দাঁড়াও।"...

'কী রে বাবা, আবার কি ফ্যাসাদ বাধায়। দেখি খানিকটা কটমট করে চেয়ে থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা আমার কোলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে, "এটা আমার কি হবে, এটাও নিয়ে যাও। আমি সিগারেট খাই না। টাকা ভাঙাবার জন্যেই কেনা। পয়সার জন্যে পরোয়া করি না—সেটাও বুঝিয়ে দিতে চাই। দশপয়সা কিছুই নয়, তুমি যে ভাববে কিংবা পাঁচজনের কাছে বলে বেড়াবে, বেটা মাতালকে ঠকিয়ে নিয়েছি দশপয়সা, বেহেড মাতালটা বুঝতেও পারে নি—সেটি হচ্ছে না। সে আমি সহ্য করব না। ভদ্দরলোকের ছেলে মদ খেয়েছি—মানুষেই মদ খায়, কুকুরে তো খায় না, পয়সা না থাকলে মদ খাওয়াও যায় না—তাই বলে মাতাল হবো নাকি। হুঁ!" বুঝুন ব্যাপার!'

মণিময় প্রশ্ন করল, 'তা আপনি কি করলেন?'

'প্রথমটা খুব রাগ হয়ে গিছল। ভেবেও ছিলুম একবার ওরই মধ্যে—ঐ প্যাকেটটা ওর মুখের ওপর ছুঁড়ে মারি, তার পর মনে হল—মাতালের কাণ্ড, আরও কী ক'রে বসবে, মাঝখান থেকে হয়তো আরও খানিকটা দেরি হয়ে যাবে, লোক জড়ো হয়ে মজা দেখতে আসবে সব। তাই রেখেই দিলুম। এই যে, পকেটেই আছে। আপনাদের জন্যেই রেখেছি—মানে যদি আপনাদের দেখা পাই আপনাদের খেতে দোব, আর না হয় কোন সিগারেটের দোকানে দিয়ে নিজের সস্তামার্কা সিগারেট যে ক'প্যাকেট হয় কিনে নেব—'

'কেন, আপনি তো খেতে পারেন, পেয়েছেন ভাল জিনিস—'

'কেন ভাই গরীবের ছেলে নোলা বড় করতে যাই?...যা বারোমাস কিনে খেতে পারব না—তা খেতে গিয়ে অব্যেস নষ্ট করব? এক-আধটা আপনারা পেসাদ দেন সে আলাদা কথা। এক প্যাকেট পুরো খেলে আর আমার এই পাঁচআনা প্যাকেটের দামী মাল রুচবে?'

এই বলে খুব একচোট হেসে নিলেন অবনীবাবু।

তার পর পকেট থেকে প্যাকেটটা বার করে প্রভাসের হাতে দিয়ে বললেন, 'নিন, শুরু করুন।'

মণিময় বললে, 'এইভাবে মাতালের পাল্লায় পড়লে তো মহা বিপদ। রাত-বিরেত, আপনি আবার একা থাকেন—'

আমি বললুম, 'কিন্তু মাতালেই পয়সা দেয় বেশি, সেটা দেখতে হবে তো।'

অবনীবাবু সায় দিলেন, 'তা দেয়। দেয় মানে দিত বলাই উচিত।···এখন পয়সাটাই যেন বাজার থেকে উধাও হয়ে গেছে। আমি যখন প্রথম আসি এ লাইনে বিধান রায়ের ধাপ্পায় ভুলে—তখন সত্যিই পয়সা ছিল। একো-একো মাতালের কাছ থেকে এক রাত্তিরে অমন শতাবধি টাকা কামিয়েছি। এখন সাতটা মাতাল ঠেঙালেও একশো টাকা বেরোবে না।'

'তা এই রাত-বিরেতে একা ঘোরেন, মাতাল-টাতাল উঠলে ভয় করে না?'

একটুখানি চুপ ক'রে রইলেন অবনীবাবু।

বোধ হয় কী একটা ভাবছিলেন।

তার পর গলায় অকারণেই খানিকটা জোর দিয়ে বললেন, 'ভয়? হ্যাঁ, আগে আগে করত বৈকি। লোকও নিয়েছি সঙ্গে রাত্রে চালাবার জন্যে—কিন্তু সে তখন পোষাত। এখন একটা কেন সাতটা লোক থাকলেও তো রাত দশটার পর চালাতে সাহস হবে না। এমনিই তো—সন্ধ্যের পর আদ্দেক পাড়ায় যেতে পারি না, ডবল ভাড়া পেলেও না। কী ভরসায় লোক নেব বলুন? একপেট খেতে দিতে হবে, হুটো টাকা—তার ওপর চা পান বিড়ি এসব তো আছেই। পাঞ্জাবীরা নেয়, বিহারী মুসলমানরা নেয়—আত্মীয়-স্বজন ছোকরা—তারাও পরে গাড়ি চালাবার আশা রাখে, কতকটা শেখার জন্যেই সঙ্গে আসে। ওরা এখানে প্রবাসে কাটায়—বুঝলেন না, এক জায়গায় জড়ো হয়ে থাকে—আত্মীয়-স্বজন, বেকার ছোকরা তার মধ্যে ঢের, তাদের

কাউকে নিলে এক পয়সা খরচ নেই, এক-আধ কাপ চা ছাড়া। পাঞ্জাবীরা তো বিড়ি-সিগারেটও খায় না। মদ খায়। তা ওসব সাকবেদদের দিতে হয় না। উলটে তেমন অল্পরয়িসী খুবসুরৎ ছোকরা পেলে অন্য শখও মিটিয়ে নেয়।'

এই বলে একটা অর্থপূর্ণ চোখের ভঙ্গী করলেন অবনীবাবু।

যেটা মুখে বলা যায় না, শব্দগুলো গলায় বাধে সেইটেই চোখের ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন।

মণিময় এতক্ষণ চুপ করে ছিল।

সে বলল, 'আচ্ছা', মাতাল হয়ে কেউ মারধোর করতে আসে না? কিংবা কোন হ্যাঙ্গাম হুজ্জুৎ?'

'মাতালের গল্প খুব শুনতে ইচ্ছে করছে বুঝি?' অবনীবাবু হেসে বললেন, 'তাই কম্পাসের কাঁটার মতো ঘুরেফিরে মাতালে চলে আসছে মনটা?'

তার পর একটুখানি নিঃশব্দে গাড়ি চালিয়ে বলেন, 'না, অন্তত আমাকে কোন হ্যাঙ্গামা কি মারামারিতে পড়তে হয় নি মাতাল নিয়ে। ...বরং ও আমার ভালই লাগে। ওরা আর কোন নোংরামি করে না মাতলামি ছাড়া। তা ছাড়া ভাড়া মারেও না কেউ। যারা জাত মাতাল, মানে বেশিদিনের অভ্যেস, তাদের মনটাও সাফ হয়। আর সাহেব-সুবো কি চীনেম্যান জাপানী—এরা কেউ অভদ্রতা করে না গাড়িতে চেপে—অন্তত আমার বরাতে তেমন কেউ কখনও জোটে নি।...

'তবে মাতাল তো!' সকৌতুক হাসির সঙ্গে বলেন অবনীবাবু, 'তার একটু অন্যরকম ধরন-ধারণ তো হবেই। এই বছর-দুই আগেই দেখুন না, এক বেটা চীনে সায়েব উঠল হাতীবাগানের মোড় থেকে। উঠল তো উঠল--খুবই মাতাল হয়েছে বুঝতে পারলুম, বোধ হয় বিলিতী মালের সঙ্গে ঘরে চোলাই দিশী মালও চলেছে, হয়তো সারা-দিন ধরেই বসে বসে ঐ মাল গিলেছে—মানে উৎকট গন্ধ, বত্রিশ

নাড়িতে পাক দিয়ে উঠল গাড়িতে বসার সঙ্গে সঙ্গে - তবু এমনি কোন পা-টলা কি বেএক্তার হওয়ার কোন লক্ষণ দেখলুম না। যাই হোক, কোথায় যাবে বলবে তো? কিছু বলে না, গাড়িতে উঠেই এক কোণে বসে ঝিমুতে লাগল। শুধু উঠেই একবার বলেছিল, "চলো জোরসে"।

'জোরসে তো যাব বুঝলুম। কিন্তু কোন্ চুলোয়? জিজ্ঞেস করলুম, "কিধার জায়গা"? চোখ বুজেই উত্তর দিলে, "চিটি চিটি ব্যাঙ ব্যাঙ"। সে আবার কি? সে কোন্ জায়গা, নামও তো শুনি নি। শুধোলুম, "কাঁহা"? আবারও সেই এক উত্তর, "চিটি চিটি ব্যাঙ ব্যাঙ"। অগত্যা গাড়ি থামালুম, বললুম, "সিধা সিধা বলিয়ে কাঁহা জানে হোগা, আপকা বাত নেহি সমঝতা"।...

'এবার হুঁশ হ'ল, চোখ চেয়ে পিট পিট ক'রে তাকিয়ে চারিদিক দেখে নিয়ে যেন একটা হুঙ্কার ছাড়ল, "সিধা চলো, সিধা"।

'খুব ভাল কথা, সিধাই চালাতে লাগলুম। কর্নওয়ালিশ ধরে আসছিলুম —ওয়েলিংটন না কি যেন সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার বলে আজকাল, কাছাকাছি এসে আবারও বললুম, "আব কিধার"? আবারও সেই উত্তর, "সিধা"।

'বুঝলুম বেটা ঘোর মাতাল হয়েছে, অকারণেই খানিকটা ঘোরাবে। হয়তো সারারাতই এমনি ঘুরতে হবে।

'তা হোক, পকেটে যদি টাকা থাকে, আর সে টাকা যদি আমার পকেটে চালান হয় তো আপত্তি নেই। কিন্তু তেমন রেস্ত আছে কী? সেই কথা।...

'কিন্তু ও মশাই, চোখ বুজে বসে থাকলে কি হবে, জ্ঞান টনটনে, সোজা চলে তালতলার মোড়ে পোঁছতেই আবার সেই হুঙ্কার— "ডাহিনা চলো"। তার পর অমনি ডাইনে বাঁয়ে ঘুরতে ঘুরতে একসময় লিণ্ডসে স্ট্রিটে এসে পড়লুম, একেবারে-গ্লোব থিয়েটারের সামনে এসে গর্জন করে উঠল "রোকো হিঁয়া"। তখন তাকিয়ে দেখি গ্লোবে বোধ

হয় হিন্দী কোন ছবি হচ্ছে—"চিটি চিটি ব্যাঙ ব্যাঙ" নাম।…বুঝলুম, ব্যাটার হাউস-টাউস মনে নেই, ছবিটার নাম মনে আছে। কে জানে যা উদ্ভট নাম হয়তো বা চীনে ছবিই মনে করেছে ব্যাটা।…তা সে যাই হোক, ভাড়াটা ঠিক দিয়েছিল, মায়—ক' আনা পয়সা বেশিই। মানে, চেঞ্জটা আর ফেরত চায় নি। তবে এটা ঠিক, সেদিন খুব ভয় পেয়েছিলুম প্রথমটায়। ওর যে এতটা হুঁশ আছে তা একবারও মনে হয় নি, ভেবেছিলুম যা বলছে সব মদের ঝোঁকে।'

যে সিগারেটটা ধরানো হয়েছিল তা বহুক্ষণ পুড়ে গেছে।

টানা হয় নি বেশির ভাগই।

প্রভাস এবার আর একটা সিগারেট ওঁর হাতে গুঁজে দিল, নিজেও ধরালো আর একটা।

একবার দু'বার না-না ক'রে ভদ্রলোক সিগারেটটা নিলেন, ধরিয়ে লম্বা টানও দিলেন দু'তিনটে। তার পর 'আঃ' বলে একটা আরামের নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'মাতালের জয় হোক, ব্যাটা সিগারেটটা ছেড়েছে ভাল।'

মণিময় বলল, 'মাতালের জয় তো চারিদিকেই। মদ খাওয়া যা বেড়েছে—বেড়েই চলেছে দিন দিন, মনে হয় এবার আর মাতাল ছাড়া কেউ থাকবে না। অথবা যারা মদ খাবে না তাদের সব জন্তু ভাববে, অসভ্য, আদিম বন্য প্রাণী।'

'তা ঠিক।' সায় দিয়ে বললেন অবনীবাবু, 'আজকাল ছোট ছোট ছেলেদের মধ্যে যা মদ খাওয়া বেড়েছে—বিশবছর আগে ভাবতেও পারতুম না। এই তো পাঁচ-ছ'দিন আগেই, এক ছোকরা উঠল, সন্ধ্যের একটু আগে—মদে চুর হয়ে আছে, এদিকে এখনও গোঁপের রেখাও দেয় নি ভাল ক'রে। বয়স খুব বেশি হ'লেও—মানে ধরুন যদি মাকুন্দ ধরে নিই তাহ'লেও আঠারো-উনিশ বড় জোর।

'আমার তো ভাই দেখে ভয় হয়ে গেছল। ঐ একরত্তি ছেলে অত মদ খেয়েছে—হয়তো আর একপয়সাও পকেটে নেই ভা'

দেবার মতো। তা ছাড়াও, ছেলেমানুষ তো, হয়ত কত কি মাতলামি জুড়ে দেবে, হয়তো বমি ক'রেই ভাসাবে গাড়ির ভেতরটা—সাফ করতে প্রাণান্ত হবে, আজকের সন্ধ্যেটাই মাটি হয়ে যাবে—ভেবে একটা কিছু অজুহাত দিয়ে সরে পড়ব ভাবছি, ছেলেটা বলে উঠল, "ভাবছেন আমি ড্রাঙ্কার্ড? মাতাল হয়েছি? ভয় নেই। মদ খেয়েছি —হ্যাঁ, মানছি মাত্রাটা একটু বেশিই হয়ে গিয়েছিল—পরের পয়সায় ভাল মাল দেখে লোভ সামলাতে পাবি নি। তাই বলে মাতাল যাকে বলেন আপনারা—তা হই নি। মাতালে বড্ড ঘেন্না আমার। টাকাও নেই ভাববেন না, টাকা আছে। চান তো আগাম দিতে পারি পাঁচ টাকা। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে যাব, ওব থেকে বেশি উঠবে না।...বাসেই যেতুম, নেহাত একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়ে পা দুটো আনস্টেডী হযে গেছে—কোথায় পড়ে-টড়ে মবব—তাই ট্যাক্সী করা।...বুঝছি তবু আপনার সন্দেহ যাচ্ছে না।...এই নিন"।

'সত্যি সত্যিই একটা পাঁচটাকাব নোট বার ক'রে আমার বুক-পকেটে গুঁজে দিল ছোকরা। এর পর আর কিছু বলাব থাকতে পারে না। আমিও বলতে পারলুম না। গাড়ির দরজা খুলে দিতে হ'ল।

'গাড়িতে বসে গাড়ি ছাড়তে ছোকরা মুখ খুলল। বুঝলুম নেশাটা বকুনিতে গিয়ে পৌঁচেছে। কত কী যে বকতে লাগল কী বলব—অবিশ্রাম বকুনি সারাটা পথ। তবে একটা গল্প খুব ভাল বলেছিল মনে আছে এখনও। বলেছিল, "আমি মাতাল হই নি, তবে মাতাল হ'লে লোকে কী করে তা জানি। শুনবেন সে গল্প? শুনুন তবে।...এক কানা আর এক খোঁড়া ভিখিরী এই সাহেব-পাড়ায় ভিক্ষে করত। তখনকার দিন তো—লোকের পয়সা ছিল, বিশেষত সাহেবদের—বেশ ভাল ভিক্ষেই দিত। ফলে ওদের দুজনের হাতেই কিছু পয়সা জমে-ছিল। একদিন ওর মধ্যে যেটা কানা সে খোঁড়াকে বললে, এই—চল্ একটা বড় হোটেলে ঢুকে বয়ং মদ খেয়ে আসি, যাবি? আমি তো চোখে দেখতে পাই না—তুই যদি নিয়ে যাস তো যাই চল্।...

খোঁড়াও রাজী হয়ে গেল। ওরই মধ্যে একটু ভাল জামাকাপড় যোগাড় ক'রে পরে দুজনে চলল একটা নাম-করা বার-এ মদ খেতে।··· ওরা যাচ্ছে, যেতে যেতে পথে আর একটা ভিখিরীর সঙ্গে দেখা। সে বেটার অনেকদিন কিছু জোটে নি, হাতে একটাও পয়সা নেই। তবু শখ তো আছে, এরা কোথায় যাচ্ছে শুনে বলল, এই, আমায় একটু নিয়ে যাবি? আমার হাতে কিন্তু একটাও পয়সা নেই, তা বলে দিচ্ছি!···এরা তখন মদ খেতে যাচ্ছে, দিলদরিয়া দরাজ মন, বললে, কুছ্ পরোয়া নেই, চল্ আমরা তোর খরচা দেব"।'

এর মধ্যে একটা জ্যামে পড়ে গেছল গাড়ি—বেশ কিছুক্ষণ আটকে বসে রইল।

অবনীবাবু নেমে গিয়ে একটা লরীওলার ওপর তম্বি ক'রে, রিক্সা-ওলাকে খিঁচিয়ে, ঠেলাওলাকে গালাগাল দিয়ে অনেক কষ্টে একটু পথ ক'রে নিয়ে ফিরে এসে আবার ষ্টিয়ারিং ধরলেন।

আমরা অধৈর্য হয়ে উঠেছিলুম এতক্ষণে।

ফিরে এসে বসতেই প্রায় সমস্বরে বলে উঠলুম, 'তার পর?'

'বলছি ভাই।'

গাড়ি ছেড়ে তিনি আবার সেই ছোকরার জবানীরই খেই ধরে নিলেন।

বললেন, 'ছোকরা বেশ রসিক কিন্তু, বেশ রসিয়ে রসিয়ে জমিয়ে গল্পটা বলেছিল। বলেছিল, "গেল তো তিনজনে। মদ দিয়েছে, খাচ্ছেও। অভ্যেস তো নেই—একটু পরেই রঙ চড়েছে। যেটা কানা সে হঠাৎ বলে উঠল, ছাখ ছাখ, মদের মধ্যে ব্যাটারা গালা গুলে দিচ্ছে।···গালা! বাকি দুজনেই যেন লাফিয়ে উঠল, কী, বলছিস কী? গালা দিচ্ছে?·· তবে আর বলছি কী, কানাটা বললে, স্রেফ চাঁচ গালা গলিয়ে মদ বলে চালাচ্ছে।···খোঁড়ারও তখন তুরীয় অবস্থা তো, বললে, দাঁড়া, আসুক এবার বেটা মদ নিয়ে, লাথিয়ে লাথিয়ে মেরে ফেলব বেটাকে। আর ঐ যে তৃতীয়জন গেছল, যার ট্যাঁক

গড়ের মাঠ, সে বলে উঠল, হ্যাঁ, বেশ ক'রে ধোলাই দে বেটাকে—কোন ভয় নেই, মরে যায় পুলিসে ধরে, আমি আছি, যেত্তা লাগে আমি দেব, খরচা করব !···তা বুঝলেন না, মদের এমনি মহিমা, পেটে পড়লে কানা চোখে দেখে, খোঁড়ায় লাথি মারে, আর যার অন্তভক্ষ্যোধনুর্গুনো অবস্থা সে লম্বা চেক কাটে—বলে, যেত্তা লাগে রূপেয়া হাম দেগা" !'

হাসলুম আমরা সকলেই।

অবনীবাবুও -গল্পটা নতুন ক'রে মনে পড়ে যেতেই বোধ হয়—খুব খানিকটা হেসে নিলেন।

অনেকক্ষণ ধরে হাসলেন—কিস্তিতে কিস্তিতে।

তার পর বললেন, 'আর একবার এক যোগী মাতালের পাল্লায় পড়েছিলুম ভাই বুঝলেন, সে কী বিপদ! টাকা দিয়েছিল ঠিকই, প্রায় নব্বুই টাকার মতো মিটারে উঠেছিল—সবটাই দিয়েছিল—কিন্তু সারারাত ধরে ঘুরিয়েছে বেটা, একবারও থামতে দেয় নি। পরিশ্রম তো আছেই—অমানুষিক পরিশ্রম, তবে তখন শরীরে শক্তি ছিল, খাটুনি অত গায়ে লাগত না—চিন্তাটাই আসল। কী ক'রে থামব, কী ক'রে এ ভূত নামাব ঘাড় থেকে—সেই ভেবেই আরও শরীর খারাপ হয়ে গেছল। পরের দিন একদম নড়তেই পারি নি, সারাটা দিন শুয়ে ছিলুম।'

জিজ্ঞাসা করি, 'ব্যাপারটা কী?'

'আরে সেও এক পার্বণের ব্যাপার। ক্রীসমাস ইভের রাত সেটা, বেশি কামাবার লোভেই, সেদিন বিকেলে একটু ঘুমিয়ে সন্ধ্যের আগে বেরিয়েছি রাত্তিরের মতো তৈরী হয়েই, অনেক পিটব এই আশা।···তা বলতে নেই সন্ধ্যে থেকে কামিয়েছিও বিস্তর—রাত যখন সাড়ে বারোটা, হৈ হৈ ক'রে গির্জেতে গির্জেতে ঘণ্টা বাজছে, তখন এক বেটা দিশী সায়েব এসে চাপল। কোথায় যাব? না, শ্যামবাজার। ভাড়া তুলেছি মনে করুন সেই চৌরঙ্গীর বড় গির্জের কাছ থেকে—সেন্ট

পল না কি বলে—সেখান থেকে। ভালই হ'ল ভাবলুম, লম্বা সফর, তবে শ্যামবাজার থেকে এত রাতে কি আর ভাড়া পাব, হয়তো খালিই ফিরতে হবে। যাক গে মরুক গে—কী আর করা যাবে!···

'ও হরি, বুঝলেন, শ্যামবাজারের মোড়ে গিয়ে জিগ্যেস করি "কোথায় নামবেন" ? তা বলে, "নামব কি, নামবই যদি তো গাড়িতে চড়েছি কেন ? চল চৌবঙ্গী—না চৌরঙ্গী নয়, কালীঘাট"। ফিরলুম। কালীঘাটে এসে যেমন বেঁধেছি—"এইয়প্"!—করে উঠেছে। "দাঁড়াবে না। চালাও আবার শ্যামবাজার—তোমার কাজ চলা, তুমি শুধু চলবে। আমার কাজ টাকা দেবার আমি টাকা দেব"।

'ভয় হ'ল। বুঝলেন। যদি এর পর টাকা না দেয় ? টাকা যদি ওর কাছেই না থাকে? ফেরার পথে ধর্মতলার কাছাকাছি এসে বললুম, "গাড়িতে তেল নেই, তেল নিতে হবে"। "লে লেও"। হিন্দীতে লম্বা হুকুমজারী হ'ল। বললুম, "টাকা দিন। আমার কাছে টাকা নেই"।

'ও মশাই বলার ওয়াস্তা, ঝড়াকসে পকেট থেকে একগোছা নোট বার ক'রে তা থেকে দু'খানা নিয়ে ছুঁড়ে দিল আমার দিকে। বলে, "ভয় নেই। টাকা আছে, মারব না। পদ্মাসন করব বলে গাড়িতে চেপেছি। চলতি গাড়িতে পদ্মাসন করা ভারী শক্ত কাজ, যে-সে পারে না। আমার একটু মুড এলেই করব। সেই জন্যে অপেক্ষা করছি। পদ্মাসনে বসে প্রাণায়ামটি হবে আর টুক্ করে নেমে যাব। সংসারে যা চ্যাঁ-ভ্যাঁ—আপিস যাব সেখানে ঝামেলা, একটু ধ্যান-যোগ করব সে জায়গা কই" ?

'ও ভাই, তার পর দেখি সত্যিই বেটা সেই গাড়ির গদির ওপর পদ্মাসনে বসবার চেষ্টা করছে। কিন্তু একে মাতাল তায় গাড়ির দুলুনি, পারবে কেন ? যতবার ঠিক হয়ে বসতে যায়, হয় ডাইনে নয় বাঁয়ে কাত হয়ে পড়ে। ঐটেই রক্ষে, সামনের দিকে পড়লে দাঁত-মুখ কেটে যেত, প্রাণায়াম করা বেরিয়ে যেত।'

'তার পর? ব্যাপারটা থামল কখন?' প্রভাস যোগ করল।

'থামবে কী? তার পদ্মাসনও হয় না, আমিও থামাতে পারি না। শ্যামবাজার থেকে কালীঘাট আর কালীঘাট থেকে শ্যামবাজার এই শুধু ক'রে চলেছি। যখনই বলতে যাই এবার নামুন—তখনই খিঁচিয়ে ওঠে, "কভি নেহি"। খালি চল আর চল।

'শেষে বুঝলেন না, আমার হাতের মাস্‌ল্ সব স্টিফ্ হয়ে উঠল, আর পারি না। অথচ কী যে করব তাও মাথায় আসছে না। ও বেটার আর কি, মদের ঝোঁকে শরীরের কষ্টও অত বুঝতে পারছে না তো— সে তার আসন করেই যাচ্ছে। শেষে একেবারে শেষরাত্তিরে, ভোর পাঁচটা হবে তখন—একটা মতলব মাথায় গেল, চৌরঙ্গী থেকে বোঁ ক'রে গাড়িটা ঘুরিয়ে পার্ক স্ট্রীটে পড়ে সিধে একেবারে চলে গেলুম থানায়, থানার সামনে গাড়ি থামিয়ে বললুম, "নামবেন তো নামুন, নইলে এখুনি পুলিস ডাকব, বলব, আমার গাড়িতে চড়ে মাতলামি করছেন, অকারণে ডিটেন ক'রে রেখেছেন আমায়। ট্রেসপাসের চার্জ আনব"। রাগের চোটে বুঝলেন, এমনি যা মুখে এল তো বললুম, কিন্তু তাতেই কাজ হ'ল। কে জানে কেন, থানা আর পুলিস শুনেই বেটা যেন কেমন চুপসে গেল একেবারে। সুড় সুড় ক'রে বাপের সুপুত্তুরের মতো ভাড়া চুকিয়ে নেমে গেল।

'দেখলুম তার পর—একটু রেস্ট নেবার জন্যেই বসে ছিলুম গাড়ি রেখে—এদিক-ওদিক চাইতে চাইতে খানিকটা দূরে গিয়েই দে-ছুট। অত যে নেশা, পাও টলল না একটু। তার নেশা তখন একেবারে ছুটে গেছে যেন। তেঁতুল খাওয়ার মতো। মনে হয় কোন ক্রিমিন্যাল-টিমিন্যাল বুঝলেন, পুলিসের হাতে পড়লে বোধ হয় সহজে অব্যাহতি পেত না, কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ত। সেই জন্যেই অত ভয়।'

পাঁচ

এর পর আর অনেকদিন কোন পাত্তা পাওয়া গেল না ভদ্রলোকের।

আমাদের যেন নেশার মতো পেয়ে বসেছিল ওঁর সাহচর্য, তাই প্রত্যহই রাত্রে বেরিয়ে ওঁকে খুঁজতুম।

এক একদিন পনেরো-কুড়ি মিনিটও দাঁড়িয়ে থাকতুম ওঁর আশায়। হাতের কাছের ট্যাক্সী ছেড়ে দিয়েও।

অনেক দিন ট্যাক্সীও করতে ইচ্ছে করত না তার পর, হেঁটেই শিয়ালদা চলে আসতুম।

অবনীবাবুও যে আমাদের চাইতেন সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ ছিলুম।

মনে আছে, দ্বিতীয় যেদিন ওঁর গাড়িতে ফিরি—ভদ্রলোক ভাড়াই নিতে চান নি, অনেক কষ্টে জোর ক'রে টাকাটা গছিয়ে ছিলুন।

আমাদের সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত প্রীতি বা আকর্ষণের এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে?

তিনিও প্রতিদিন রাত ন'টায় এখানে পৌঁছবার জন্যে ছটফট করছেন নিশ্চয়ই—কিন্তু কোথায় কোন্ দিকে গিয়ে পড়ছেন কোনদিন তার ঠিক নেই তো, খুব দূরে গিয়ে পড়লে আবার এদিকের ভাড়া না পাওয়া পর্যন্ত এখানে আসাও তো মুশকিল।

শুধু আড্ডা দেবার জন্যে কিছু তেল পুড়িয়ে আসা যায় না।

বিশেষ গাড়ি যখন ওঁর নিজের নয়।

কত মাইল এম্পটি যেতে পারেন, মালিক কতটা মেনে নেবেন—সে বন্দোবস্ত আগেই করা থাকে। তার চেয়ে বেশি দেখালে শুনবেন না।…

পর পর ক'দিন দেখে আমরা আশা ছেড়েই দিয়েছিলুম ভদ্রলোকের।

ভুলেও গেলুম ক্রমশ। যেতে

কলকাতার এই অতি-গরম আবহাওয়া, পশ্চিমবঙ্গে ত্রাসের রাজত্ব, দিল্লীর বর্তমান রাজনীতি, ইন্দিরা গান্ধীর পরিণত শাসনবুদ্ধি, পূর্ববঙ্গের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ—এর ভেতরে দু'দিনের পরিচয়ের স্মৃতি বা সাহচর্যের নেশা সহজেই কেটে যাবে, ভুলে যাব আবার—এই তো স্বাভাবিক।...

অবশ্য মধ্যে আমিও ছিলুম না কলকাতায়।

কাশ্মীব বেড়াতে গিয়েছিলুম।

সেখানেও এক আশ্চর্য মানুষকে পেয়েছিলুম।

আলিবক্স।

তার কথাটা যদি এখানে বলে নিই—আশা করি পাঠকদের মন্দ লাগবে না।

সেও পথের ধারেরই লোক। একেবারেই পথের ধাবেব।

আলিবক্সের সঙ্গে আমাদের দেখা বাটোট ডাকবাংলোয়।

ডিল্যুক্স বাস একদিনেই পৌঁছে দেয়—শ্রীনগর। কিন্তু সেটা আমরা পাই নি।

আমাদের গাড়ি পাঠানকোট পৌঁছল যখন, সে বাস ছেড়ে গেছে।

সাধারণ বাস ভরসা। দু'দিনের সফর, মধ্যে একটা রাত কোথাও কাটাতে হবে।

কুদ্-এই নাকি প্রথমদিন যাত্রার বিরতি ঘটবে শুনে এসেছিলুম—কিন্তু আমাদের বাস কুদ্-এ এসে পৌঁছল বেলা চারটেরও আগে, তখনও বেশ বেলা, হয়তো সেই জন্যেই মিনিট পনেরো চা খাবার অবসর দিয়েই বাস আবার ছাড়ল; একেবারে ঝিকিমিকি বেলায় এসে নামিয়ে দিল বাটোটে।

পল না শুনলাম সেখানেই বিশ্রামের 'উত্তম প্রবন্ধ' অর্থাৎ কিনা উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত আছে।

তা ছাড়া এখন আব এগনোও যাবে না।

সামনের গেট আজকের মতো বন্ধ হয়ে গেছে, খুলবে সেই কাল সকালে।

ঝিকিমিকি বললুম বটে, কিন্তু সেটা সেই পাহাড়ের ওপরে—ডাক-বাংলোর সর্বোচ্চ ঘরটাতে।

নিচে তখনই বেশ অন্ধকার, সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে বেশ একটু অসুবিধাই হ'ল।

সিঁড়িও তো এমন কিছু নয়, পাথর কেটে কেটেই সিঁড়ির মতো করা।

গৃহিণী তো সারাটা পথ গজগজ করতে করতে উঠলেন, তাঁকে নাকি মেরে ফেলার জন্যই ঐখানে আশ্রয় ঠিক করেছি আমরা।

তবু ওপরে উঠে মনটা প্রসন্ন হয়ে উঠল।

এই দুটো ঘরই (না তিনটে ? ঠিক মনে নেই) সবচেয়ে ওপরে, এর ওপর কিছু নেই।

গোটা শহর বা জনপদটাই আমাদের পায়ের নিচে বলতে গেলে।

সৌভাগ্যক্রমে পাশের ঘরেও কেউ ছিল না, আমাদের এই ক'টি প্রাণীরই রামরাজত্ব।

সন্ধ্যাটাও ছিল মিষ্টি, সেদিন বিজয়া দশমী, তখনই অনেকটা চাঁদ উঠে গেছে, তারই আলোয় সামনে-পাশে-পেছনে বিপুল পর্বতশ্রেণী যেন এক স্বপ্নময় অস্পষ্টতার বিচিত্র এক মায়াজাল সৃষ্টি করেছে।

জ্যোৎস্নালোকে নিচের বিজলী আলোগুলোকে ম্লান দেখালেও—হয়তো ম্লান দেখাচ্ছে বলেই—তারও আকর্ষণ লোভনীয় বোধ হচ্ছে।

তার মধ্যে এই নির্জন নিস্তব্ধতা, পশ্চিম দিগন্তে দিনের তখনও শেষ চিহ্নটুকু, আর চারদিকের ফুলের সমারোহ—প্রাণটা যেন সত্যিই জুড়িয়ে গেল।

ডিল্যুক্স বাস-এ গেলে আজই রাত দশটায় শ্রীনগর পৌঁছে যেতে পারতুম—এই সব ঝামেলা হ'ত না—অনেকেই বলাবলি করছিলেন।

ডিল্যুক্স বাস-এ চড়তে না পারাটাই যেন একটা প্রকাণ্ড লোকসান হয়ে গেল এ যাত্রায়।

কিন্তু আমার সেজন্যে কোন আপসোস নেই।

না-ই বা পারলুম আজই শ্রীনগর পৌঁছতে, সেখানে পৌঁছলে আর এর থেকে কী এমন বেশি পেতুম।

পথের প্রান্তই সব—পথ কিছু নয়—এ কথাটা অন্তত এই সব শৈলপুরী যাত্রার পক্ষে খাটে না।

যেখানে লক্ষ্য শহর কি শহুরে তীর্থ, সেখানে হয়তো গন্তব্যস্থলে তাড়াতাড়ি পৌঁছনোর কিছু সার্থকতা থাকতে পারে, এখানে কী?···

দার্জিলিঙের পাহাড়ে পথটা বাদ দিয়ে কলকাতা থেকে হেলি-কপ্টার চেপে ঝুপ করে একেবারে চাঁদমারীতে নামছেন—ভাবুন দিকি ব্যাপারটা!

সুস্থ হয়ে বিছানাপত্র খুলে বসার পর সকলেই স্নানাদির জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লুম।

তার পর বিজয়াকৃত্য।

মিষ্টান্ন কিছু সঙ্গে ছিল—পাঠানকোট থেকে সংগ্রহ করা—কিন্তু তাতে শুধু নিয়মরক্ষাই হ'তে পারে, রাত্রের ভাবনা তাতে মেটে না।

যাই হোক, আমরা বাইরে চেয়ার টেনে নিয়ে বসলুম, শ্রীমান ভানুরা নেমে গেলেন নিচে কোথায় কি পাওয়া যেতে পারে—তারই সন্ধানে।···

খবর মিললও।

বাংলোর সঙ্গেই লাগোয়া ক্যান্টিন বা হোটেলমতো আছে।

ডাল সব্জী মাংস রুটি ভাত—সবই আছে—কিন্তু নিচে গিয়ে ডাইনিং-রুমে খেতে হবে।

আমি রাজী ছিলুম, কিন্তু আমার গৃহিণী সোজা বলে দিলেন যে, তার

থেকে তিনি বরং রাত্রে না খেয়ে থাকবেন সেও ভাল—আবার এই চড়াই-উৎরাই করতে পারবেন না। তাঁর উদ্ধত রক্তচাপ এতখানি চাপ সহ্য করতে প্রস্তুত নয়।

অগত্যা—স্থির হ'ল তরুণরা খেয়ে আমাদের জন্যে যাতে করে হোক কিছু খাবার নিয়ে আসবে।

এ দেশে পাতার চলন নেই—না থাক, খবরের কাগজ আছে, আর যদি কিছু পয়সা জমা রাখলে ওদের কাছ থেকে 'বর্তন' 'কটোরা' পাওয়া যায় তো কথাই নেই।

সেই মতো ওরা নিচে নেমে গেল মণীশ প্রদোষ ভানু।

সেখানে গিয়ে তিনমাথা এক ক'রে কী করল জানি না—কারণ ইতিপূর্বেই বকশিশের লোভ দেখিয়েছিল তাতে নাকি ফল হয় নি—সম্ভবতঃ তিনজনের মিলিত মিষ্টবাক্যেই কাজ হয়ে থাকবে—হোটেলের কর্মকর্তা বিগলিত হযে 'সাহেব' ও 'মেমসাহেবে'র ভার গ্রহণ করলেন, ও ওদের 'খাতেরজমা' থাকতে বললেন।

সেই উপলক্ষ্যেই আলিবক্সের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ—এবং প্রায় সে-ই শেষ।

আমরা দুজনে ঘরের দরজা দিয়ে বিছানায় শুয়ে লেপ চাপা দিয়েছি সবে—কারণ ওরা খুব তাড়াতাড়ি ফিরবে--এমন মনে করার কোন কারণ নেই, নিজেরা খেয়ে খাবার নিয়ে আসবে এই কথা আছে—হঠাৎ দরজায় খুট-খুট মৃদু আওয়াজ হওয়ায় বিস্মিত হয়ে উঠে পড়লুম।

ওরা নয়—তাহ'লে ডাকত বা কড়া নাড়ত, যে এসেছে সে দরজায় মৃদু টোকা দিচ্ছে, একেবারে সাহেবী কায়দায়।

দরজা খুলে আরও চমকে উঠলুম।

চমকে ওঠারই কথা।

বাইরে বারান্দাটা অন্ধকার—আলোর ব্যবস্থা আছে, জ্বলছিলও, খুব সম্ভব অকারণ কারেন্ট পোড়ার কথা ভেবে ছেলেরা নিভিয়ে দিয়ে গেছে—তার ওদিকে চাঁদের আলো ও নিচেকার দু'একটি বিজলী-বাতির আভা মিলিয়ে যেন একটা রহস্যের সৃষ্টি করেছে, তারই মধ্যে সেই রহস্যকে ঘনীভূত ক'রে যেন দাঁড়িয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের সেই ক্ষুধিত পাষাণ বা ঐ ধরনের কোন কাহিনীর রহস্যময় চরিত্র।

ঘরের আলোটাও তার মুখে পড়ে নি, কিছুটা পোশাকে পড়েছে এই মাত্র।

লম্বা একহারা এক পুরুষ, সাদা দাড়ি-গোঁফ—কতকটা মুঘলশাহী ধরনে ছাটা—দাড়ির ডগায় আভিজাত্যসূচক একটু মেহেদার ছোপ, পরের দিন সকালে সেটা ভাল ক'রে দেখা গেছে, মাথায় আস্ত্রাকান টুপী, সাদা চুড়িদার পাজামা ও গরম 'উনা' আচকান, মনে হ'ল আরভিন সাহেবের বা স্যার যদুনাথের লেখা কোন ইতিহাসের পাতা থেকে কোন সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষ ওয়াজার-উল-মুলক্ জীবন্ত হয়ে এসে সামনে দাঁড়িয়েছেন।

তাই-ই ভাবতুম, হয়তো সেইভাবেই সম্ভাষণ করতুম, যদি না উক্ত রাজপুরুষের হাতে সাদা তোয়ালে ঢাকা একটি ডাগর ট্রে থাকত।

তবু, এই আবির্ভাবের মতো আগমন যে আমাদের মতো নিতান্ত সামান্য জনের আহার্য যোগাতেই ঘটেছে—তখনও যেন ঠিক বিশ্বাস হ'তে চাইল না।

কী বলব, কী বলে কোন্ সম্বোধনে সম্ভাষণ জানাব ভাবছি, সেই লোকটিই আমার সকল দায়িত্ব ও চিন্তা লাঘব ক'রে দিয়ে প্রথম সম্ভাষণ জানাল, 'বন্দিগী হুজৌর, আপকে খানা লে আয়া হুজৌর।'

তবু ঠিক 'আও' কি 'অন্দর লে আও' বলতে পারলুম না, গলায় বাধল যেন।

বললুম, 'আইয়ে, অন্দর আইয়ে।'—এবং বেশ সসম্ভ্রমেই পথ ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ালুম।

সে লোকটি আবারও মাথা নিচু করে অভিবাদন জানিয়ে ভেতরে এল।

ট্রেটি সযত্নে একটা চেয়ারে নামিয়ে রেখে আগে দরজাটা আবার বন্ধ করল—সম্ভবতঃ সাহাবলোগদের ঠাণ্ডা লাগার আশঙ্কায়, তার পর ট্রের ওপরের তোয়ালেটা (খাবার ঢাকা দেওয়া একটা ঝাড়নের ওপরে অতিরিক্ত একখানা বড় তোয়ালের মতো ছিল পাট করা) টেবিলের ওপর দস্তরখান হিসেবে বিছিয়ে দিতে দিতে ঈষৎ ধরা-ধরা অথচ গম্ভীর অভিজাত কণ্ঠে বলল, 'মেরা নাম আলি বক্স্ হুজৌর। আপকা বান্দা।'

তার পর বিশুদ্ধ উর্দুতেই কৈফিয়ৎ দিল, 'মালিক কি বলে জানেন হুজৌর ? টিবিলে তো টিবিল কালাথ্ পাতাই আছে, আর সে তো বদলাতেই হবে—মিছিমিছি একটা সাদা তোয়ালিয়া নষ্ট ক'রে লাভ কী ? আমি সাফ্ বলে দিলুম হুজৌর, আমাকে যদি কোন কাম করতে হয় আমি দস্তুর-মাফিকই করব। খানা যোগাব আমি আর দস্তরখান নিয়ে যাব না—সে আমাকে দিয়ে হবে না। যে কাজের যা অঙ্গ, রেওয়াজ। তা ছাড়া টিবিল কালাথ্ যদি এখন থেকেই গান্দা হয়ে যায়—কাল সকাল পর্যন্ত তো সাহাবদের থাকতে হবে,- সে ওঁদের অসুবিধা হবে না।...ছো। একটা তোয়ালিয়ার জন্যে এত।...আলিবক্স হুজৌর এই খানসামার কাজ ক'রে ক'রে বুড়ো হয়ে গেল। কম সে কম সত্তর সাল হয়ে গেল উমর—খানদানী আদমী কি সাহাবদের সামনে কি ক'রে খানা সাজিয়ে দিতে হয় তা সে জানে। আমি ন্যাপকিন তক্ নিয়ে এসেছি হুজৌর—কিচ্ছু ভুল হয় নি।'

কথা যতই বলুক—হাত তার বন্ধ ছিল না।

কথা এবং খানা সাজানো শেষ ক'রে অকারণেই আর একবার সেলাম করল—আমার ও আমার গৃহিণীর মাঝামাঝি ঘরের শূন্য জায়গাটা উদ্দেশ্য ক'রে।

অবশ্য হ্যাঁ—এটা মানতে হবে—সাজিয়ে দিতে সত্যিই জানে লোকটা।

কলাইয়ের সানকীগুলোর কানা চটা কিংবা কাঁচের বাটিগুলোর ধার ভাঙা, ফাটা—সেটা ওর দোষ নয়, বরং সেগুলোতে ত্রুটি থাকাতেই ওর গুণটা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

সেইগুলোই এমন পরিপাটি ক'রে সাজিয়ে দিয়েছে, মায় সামনে একটি ক'রে খালি ডিশ রেখে তার ওপর ন্যাপকিন সাজিয়ে যে, মনে হ'ল সত্যিই কলকাতার কোন সাহেবপাড়ার হোটেলে খেতে এসেছি।

আহার্য অবশ্য ভাঙা সানকীর সঙ্গেই মানানসই।

এই খাবরেব জন্যে এত আড়ম্বর ও সমারোহ—হাস্যকর বৈ কি।

হয়ত সেই জন্যেই। চক্ষুলজ্জাতেই—মালিক আর দস্তরখান কি ন্যাপকিন দিতে চান নি।

রুটিগুলো ভাল -কিন্তু তার অন্য উপকরণ একটাও ভাল নয়।

উরুদ বা বিউলীর ডাল, তাতে যতটা ঘি (বা চর্বি কি বনস্পতি) ততটা যদি অন্য মশলা থাকত তো ভাল হ'ত, অতিরিক্ত ঝাল ছাড়া কোন স্বাদ নেই, এমন কি নুনও কম।

একটা লাউয়ের তরকারি, তাতে বোধ হয় অর্ধেকের ওপর রশুন ও লঙ্কা বাটা।

এর সঙ্গে আছে একটু মাংস—মাংস তাতে বিরল, ঝোলই বেশি।

অথবা তাকে ঝোল বলাও ভুল।

এদেশের সব হোটেলেই যেমন একটা পিঁয়াজ-রশুন-আদা-বাটা-চর্বি (বা বনস্পতি) যুক্ত 'জুষ' রাখা থাকে—প্রয়োজন বোধে তাতেই সিদ্ধ মাংস কি ভাজা মাছ কি মাংসের গুলিকাবাব ফেলে সরবরাহ করা হয়—সেই রকমই একটা গাঢ় ঝোলে একটুকরো আধসিদ্ধ মাংস ও একটা আধটুকরো হাড় ফেলা।

তাতেও আপত্তি ছিল না—যদি সে জুষটা কিছু সুস্বাদু হ'ত।

খেতে খেতে মনে হ'ল এত খারাপ রান্না দীর্ঘকালের মধ্যে খেয়েছি বলে মনে পড়ে না।

আরও মুশকিল—স্নেহ জাতীয় পদার্থ এত বেশি এইসব ব্যঞ্জনে এবং খাদ্যবস্তু এখানে এত দ্রুত ঠাণ্ডা হয় যে, তার স্বাদ যেটুকু বা ছিল সেটুকুও ঠিকমতো পেলুম না।

ঘি-চর্বি জাতীয় জিনিসটা হাতে ও মুখে এমন পুরু হয়ে জড়িয়ে গেল যে, খাওয়াতেই আর কোন রুচি রইল না।

সেই প্রসঙ্গেই আমার স্ত্রী হিন্দী বা উর্দু হিসেবে দু' একটা 'হ্যায়' যোগ ক'রে প্রায় বিশুদ্ধ বাংলায় বললেন, 'এত চর্বি দিয়েছ আলিবক্স যে খাওয়া যাচ্ছে না, জিভ পুরু হয়ে গেছে—কোন টেস্ট পাচ্ছি না।'

'চর্বি না হজৌর। ঘিউ আছে, বড়িয়া ঘিউ।'

'হ্যাঁ! ঘিউ না হাতী!' একটু শব্দ ক'রেই হেসে উঠলুম, 'চর্বি না হয় বনস্পতি দিয়েছ। শুদ্ধ্ বনস্পতি। ঘিউ পাবে কোথায়?'

'তওবা, তওবা! মাপ করবেন হজৌর, বান্দার গুস্তাখী মাপ করবেন—অপরাধ নেবেন না—কিন্তু এটা আপনাদের কেমন বিচার হ'ল? কারবার করছে একজন, পয়সা কামাবে সেই, আমি তো তন্‌খার নৌকর—মালিকের আয় যাই হোক, আমার তন্‌খা বাড়বেও না কমবেও না। আমি কেন তার হয়ে ঝুট্ কথা বলে আপনাদের সঙ্গে বেইমানী করব?' তার পর একটু থেমে বলল, 'আর—সেও যখন কোন দোষ করে নি তখন মালিকের নামেই বা ঝুট্ সহ্য করব কেন?···আমি জানি সে ঘিউ দিয়েছে, মানে সে কিনেছে ঘিউ বলেই—তবে ঘিউওয়ালা সে ঘিউতে কি দিয়েছে—লার্ড কি ডালডা, সে তার ইমান জানে হজৌর—তবে বাজার-চলিত দাম দিয়েই সে ঘিউ কিনেছে, সেই ঘিউতেই রান্না হয়েছে—এটা আমি বলতে বাধ্য।'

এই বলে, যেন দম নেবার জন্যেই একটু থেমে বললে, 'না হজৌর, বেইমানী আমি কারও সঙ্গেই করতে পারব না। না আপনাদের সঙ্গে, না তার সঙ্গে। তাকে সামনে অনেক গালমন্দ দিই, কঞ্জুষ

বলি—কিন্তু তাই বলে আড়ালে—না। সে আমি দেব না। তা ছাড়া কি জানেন, বেইমানী চুকলি খাওয়া—এসব তো আমি চেষ্টা করলেও পারব না—আমার শরীরে যে আংরেজের রক্ত রয়েছে, ব্রিটিশ রক্ত!'

এই বলে—যেন শেষ ক'টি শব্দের বিপুল হাতবোমাটি নিক্ষেপ ক'রে আবারও সে নীরব হ'ল।

খুব সাধারণভাবে, কথাচ্ছলে বললেও তার ভেতরের বক্তব্যটা নাটকীয় এবং আমাদের ওপর নাটকীয় প্রভাবই বিস্তার করবে—সে বিষয়ে সে বেশ সচেতন দেখলুম।

এখন স্মিত প্রসন্ন এবং আপাত একটা নিশ্চিন্তভাবে দাঁড়িয়ে যেন সেই নাটকের প্রতিক্রিয়াটাই লক্ষ্য করতে লাগল।

'ব্রিটিশ রক্ত! সে আবার কী! তুমি ইংরেজ নাকি?'

অনেকক্ষণ সময় লাগল আমার স্ত্রীর কণ্ঠস্বর ফিরে পেয়ে প্রশ্নের শব্দ ক'টা উচ্চারণ করতে।

'না না, মেমসাহাব। আংরেজ আর বলতে পারছি কৈ নিজেকে, পারলে খুশি হতাম। আংরেজের রক্ত আছে আমার নাড়িতে—সেই কথাই বলেছি। এখন বুঝে নিন হজৌর। এর চেয়ে বেশি আর বলতে পারব না। আপনারাই বা শুনে কী করবেন? তবে ঝুটবাৎ আমি বলি না, কিংবা বাকতাল্লাও মারি না—যা বলেছি তা সাফ বাৎ—পুরা ষোলহআনা সাচ্চা!'

এই বলে সে আর একবার সেলামের ভঙ্গীতে মাথা হেলিয়ে খাওয়া-শেষ-হওয়া পাত্রগুলো গুছিয়ে ট্রেতে তুলতে লাগল।

আমরা হয়তো অত সহজে ওকে ছাড়তুম না—কিন্তু সেই মুহূর্তেই ছেলেরা নিচে থেকে খাওয়া শেষ ক'রে হৈ-হৈ করতে করতে এসে পড়ল।

তাদেরও সেই এক অভিযোগ 'এমন অখাদ্য বহুকাল খাই নি।'

এর পর আর কোন রহস্য উদঘাটনের নিভৃত আলোচনা সম্ভব নয়।

টাকা-পয়সা ছেলেরা নিচেই চুকিয়ে দিয়ে এসেছে, আলিবক্সও

তা জানে দেখলুম—সে তাড়াতাড়ি তার বর্তন-উর্তন গুছিয়ে তুলে নিয়ে দস্তরখান পাট ক'রে কাঁধে ফেলে নেমে গেল।

আমাদেরও সেই হৈ-চৈয়ের মধ্যে—যদিও যাবার সময় সে বেচারা জনে-জনে সবাইকে সেলাম জানিয়ে গেল—তাকে কিছু বকশিশ দেবার কথা মনে পড়ল না।···

সারাদিন বাস-ভ্রমণে সকলেরই শরীর ক্লান্ত তখন—শুয়ে পড়ার দিকেই ঝোঁক, আলিবক্সের 'আংরেজ রক্ত'র চমকপ্রদ সংবাদও উপস্থিত শ্রোতাদের মনে যথেষ্ট চমক বা কৌতূহল সৃষ্টি করতে পারল না।

মণীশ স্পষ্টই বললে, 'ও কোন ট্যাশ ফিরিঙ্গীর ছেলে হবে দেখুন গে যান—মুসলমান মেয়ে বিয়ে করেছিল, কিংবা ওর মা-ই ছিল ক্রীশ্চান কি ট্যাশ আয়া—মুসলমান খানসামাকে বিয়ে করেছিল। সেই হিসেবে—অনেক পরিমাণে ডায়ল্যুটেড হ'লেও—ব্রিটিশ ব্লাড তো বটেই। হোমিওপ্যাথিক হিসেব ধরতে গেলে আপনিও সেটা অস্বীকার করতে পারবেন না।'

এই রকমই কিছু একটা হবে ওর ইতিহাস—সেটা আমরাও মানতে বাধ্য হলুম।

এমনিতেও ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে, এই তুচ্ছ প্রসঙ্গ নিয়ে জমিয়ে বসে আলোচনা করার শক্তি বা উৎসাহ কারুরই ছিল না. কথাটা ঐখানেই চাপা পড়ে গেল।

বাস ছাড়বে পরের দিন সকাল ঠিক আটটায়—আমাদের আগে থাকতেই শাসানো ছিল—আমরা যেন তার মধ্যে গিয়ে নিজেদের আসন দখল করি।

সুতরাং ভোরেই উঠে তৈরি হ'তে হ'ল।

শীতের দেশ, তায় পাহাড়ে জায়গা—একটু ফরসা হ'তে হ'তেই

এখানে সাতটা সাড়ে সাতটা হয়ে যায়। কোনমতে বিছানাপত্র বেঁধে এতগুলি প্রাণী মুখ-হাত ধুয়ে নিচে নামতে নামতেই আটটা বাজল, ইতিমধ্যেই নাকি ছ'বার আমাদের বাস হরন্ দিয়েছে—সুতরাং একটু চা কি খাবার খেয়ে নেব এখানের ক্যান্টিনে, সে সময়ও মিলল না।

অত তাড়া দিয়ে (তাও মিনিট কুড়ি আমাদের বাসে বসে থাকতে হ'ল ছাড়বার আগে--কারণ, ড্রাইভার সাহেবের চা খাওয়া তখনও হয় নি) আমাদের বার করা হ'ল বটে—কিন্তু মোট মাইলখানেকের বেশি যাওয়া গেল না সে চোটে।

কারণ, সেইখানেই 'গেট'।

পাহাড়ী পথে এই গেটগুলিই হ'ল যন্ত্রণা-বিশেষ।

বেশির ভাগ পাহাড়ী রাস্তাই সংকীর্ণ, সুতরাং একমুখী।

ওদিকের ডাউন বাস একঝাঁক এসে বেরিয়ে না গেলে এদিকের কোন বাস উঠতে দেওয়া হয় না।

এক একটা এই ধরনের ঈষৎ-বিস্তৃত বিশেষ জায়গাতে ফটক বন্ধ ক'রে গাড়ি আটকানো হয়, তাকেই গেট বলে—সামগ্রিকভাবে সমস্ত ব্যবস্থাটাকে।

অর্থাৎ গেটবন্ধ হওয়া।

কতক্ষণ এইভাবে গর্ভযন্ত্রণা সইতে হবে—তা বাস থামবার পর কণ্ডাকটর-ড্রাইভারদের প্রশ্ন ক'রে কিছুই সঠিক জানা গেল না।

হয়তো আমরা অধৈর্য হয়ে পড়ব বলেই তারা সত্যি কথাটা বলতে চায় না।

কেউ বললে 'আধ ঘণ্টা', কেউ বললে 'করিব এক ঘণ্টা।'

গাড়ি থেকে নেমে সামনের চায়ের দোকানে চা খেতে গিয়ে আসল কথাটা জানা গেল।

দোকানের মালিক বলল, সাড়ে দশটার আগে ওধারের গেট নামবে না—কারণ, ওদিক থেকে ছ'টায় প্রথম গাড়ির ঝাঁক ছেড়েছে—পুরো সাড়ে চার ঘণ্টা তো লাগবেই।

তার ওপর কোন বাস কি লরী যদি বিগড়ে যায় তো আরও দেরি হবে—কারণ, কাউকে পাশ কাটিয়ে চলে যাবার মতো জায়গা নেই সে পথে, হয়তো দু'একটা তেমন খাঁজ মিলতে পারে—কিন্তু হিসেব ক'রে ঠিক সেইখানেই খাবাপ হবে এমন তো মানে নেই।

দেরি হয় বৈ কি, প্রায়ই দেরি হয়।

কাল অবশ্য এ গেট ছেড়েছে পৌনে এগারোটাতে—কিন্তু পরশু তরশু দু'দিনই সাড়ে বারোটা বেজে গেছে।

তাই বা কি, ধরুন ওদিকের গেট ঠিক সাড়ে দশটাতেই খুলল—সবগুলো গাড়ি পেরিয়ে গেলে তবে তো এদিকের গাড়ি যেতে দেবে! ওদিকে যদি বেশি গাড়ি এসে যায়?

তিরিশ-চল্লিশই থাকে বেশির ভাগ—কোন কোন দিন পঞ্চাশ-ষাট খানাও হয়ে যায়—সে সবগুলো যেতে যেতেই কত সময় লাগে ভাবুন না!

সব শেষের সেই গাড়িতে সবুজ নিশান দেখা যাবে তবে এরা তৈরি হবে এগিয়ে যাবার জন্যে।

বেশ অমায়িকভাবে তথ্যগুলি জানিয়ে ঈষৎ একটু হাসলেন চাওয়ালা ভদ্রলোক।

বোঝা গেল এমনভাবে আরও বহুলোককে এমনি বোঝাতে হয়েছে ব্যাপারটা।

'তবে আমাদের এত তাড়া লাগিয়ে গাড়িতে চড়ানো কেন?' বিমূঢ়ভাবে প্রশ্ন করেন গৃহিণী, 'একটু চা নাস্তা করারও সময় না দিয়ে?'

নাস্তা কথাটা দু'দিনে শিখে নিয়েছেন তিনি।

'এটা আর বুঝলেন না মেমসাহেব, গেটের ব্যাপার, যে যত এগিয়ে থাকবে সে তত আগে পৌঁছবে, তাকে ধুলোও খেতে হবে কম। আপনার তো ঐ বাস—ছ' নম্বরে আছে, দেখুন না এর ভেতরেই আরও ছ'সাতখানা গাড়ি জমে গেছে পেছনে, সাড়ে দশটা তক্ পঞ্চাশ-ষাট

খানা এসে যাবে। যারা কাল কুদ্‌-এ ছিল—তারাও এখান থেকে এই গেট ধরবে। হ্যাঁ—পঞ্চাশ-ষাট তো বটেই, বাস ট্রাক জীপ প্রাইভেট মিলিয়ে কোন কোনদিন বেশিও এসে যায়। তা ছাড়া এ গাড়িগুলো এখানে না এলে তো ডাউন লাইনের গাড়ি যেতে পারবে না, এই-খানটাই যা একটু চওড়া। সব ক'টা গাড়ি এখানে এসে জড়ো হ'লে, কুদ্‌-এ গেট বন্ধ হয়েছে খবর পেলে তবে ওদিকের গেট খোলা হবে।'

পরিষ্কার কথাবার্তা লোকটির—আমাদেরও বোঝার কোন অসুবিধা হ'ল না। মোদ্দা আমরা এই দু'ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা এখন করি কি ?

দুপুরের খাওয়াটা সেরে ফেলা যেতে পারে—কিন্তু তার পর—বা তার আগে ? ভানু গিয়ে দু'তিনটে তথাকথিত হোটেলে খবর নিয়ে এল—খাওয়াও বেলা দশটার আগে কোথাও কিছু মিলবার সম্ভাবনা নেই।

রাত্রের মাংস হয়তো পড়ে আছে—ভাত রুটি বানিয়ে দেবে—তাও খুব দ্রুত হবে না।

শীতের জায়গা জল তাততেই চায় না, তা ছাড়া তাদের খানসামা বাবুর্চি কারও আটটার আগে ঘুম ভাঙে না।

আবারও সেই মাংস !

তবু ছেলেরা বিস্তর খুঁজে কোথা থেকে দুটো বেগুন সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এল—ভেজে কেউ দিতে পারবে না—একজন হোটেলওলা দয়া ক'রে সেটা পুড়িয়ে দিতে রাজী হলেন।

তবে তাঁরও মুখ-চোখের চেহারা সন্দিগ্ধ, পোড়া বেগুন নিয়ে আমরা কি করব—এখনও বুঝে উঠতে পারছেন না।

এইভাবেই সময় কাটানো কোনমতে।

খুচরো কাজ, খুচরো আলাপ, কথাবার্তা।

কবি বলেছেন 'আলস্যের সহস্র সঞ্চয়', আমাদের বেলা ঠিক আলস্য কথাটা খাটে না—নৈষ্কর্মের সহস্র সঞ্চয় বলা যেতে পারে।

এর ভেতরেই আমি একা একটু বেরিয়ে পড়েছিলুম—পেছন দিকে।

বেড়াতে বেড়াতেই হঠাৎ মনে পড়ে গেল কথাটা।

এই তো সামান্য পথ—মিনিট পনেরোর বেশি লাগবে না বোধ হয় বাংলোয় পৌঁছতে—ফিরতেও মিনিট কুড়ি বড় জোর।

কালকের রহস্যটা একটু পরিষ্কার করার চেষ্টা করব নাকি?

ছুতোরও খুব অভাব হবে না, কাল রাত্রে বকশিশ দেওয়া হয় নি —সেইটেই দিতে এসেছি, এই তো উত্তম অছিলা।

ওদের আর কিছু বললুম না।

বললেই হৈ-চৈ উঠবে, বাধার সৃষ্টি হবে অনর্থক।

বাস ছেড়ে যাবে, আমি ধরতে পারব না পড়ে থাকব—এ যুক্তি তো পড়েই আছে।

সুতরাং কাউকেই কিছু না বলে যেমন পায়ে পায়ে হাঁটছিলুম সেইভাবেই একটু এগিয়ে ওদের চোখের আড়াল হতেই দ্রুত পা চালিয়ে দিলুম।

আর ইংরেজীতে যাকে বলে—'ম্যাজ হু লাক উড্ হ্যাভ ইট'—খানিকটা পথ এগোতেই দেখি শ্রীমান আলিবক্স সাহেবও এদিকেই আসছেন জোর কদমে।

কিন্তু আমার বাংলোয় ফিরে আসার কারণটা বিশ্বাস করতে আলিবক্স সাহেবের কিছু সময় লাগল।

লাগারই কথা—মনুষ্য-জীবনের ব্যবহারিক দিক সম্বন্ধে যাদেরই কিছু অভিজ্ঞতা আছে—তাদেরই এটা বিশ্বাস করতে সময় লাগবে যে —আগের দিন বকশিশ দিতে ভুল হয়েছে বলে কেউ পরের দিন এতটা পথ ভেঙে ফিরে আসে সেই বকশিসের টাকা পৌঁছে দিয়ে যেতে।

কিন্তু, প্রমাণটা প্রত্যক্ষ বলেই বোধ করি, বিশ্বাস করতে হ'ল।

পুরো একটি টাকা হাতের মুঠোর মধ্যে গুঁজে দিতে আর অবিশ্বাস করার কোন কারণ রইল না।

আনন্দে কৃতজ্ঞতায়—এবং তখনও কিছুটা অবিশ্বাসে—আলিবক্সের চোখ ছল ছল করতে লাগল।

বার বার শুধু সেলামই করল না—আমাদের হয়ে আল্লার কাছে 'দোয়া'ও মাগতে লাগল।

পথের ধারে যেন আমাদের জন্যেই—দুটো পরিষ্কার বড় পাথর পড়ে ছিল।

তারই একটাতে বসে পড়ে বললুম, 'কোথায় যাচ্ছলে আলিবক্স, কাজে তো দেরি হয়ে যাচ্ছে না?'

'নহি হুজৌর! আমি যাচ্ছিলাম নিচে এই সামনের বস্তিটাতে। ওখানেই আমার বাড়ি। ঘরওয়ালী আছে, ছেলেমেয়ে আছে—তাদের খবরটাও তো নিতে হয়। তা এই সময় ছাড়া আর আমার ফুরসুৎ কোথায়? বিকেলের দিকে কাজের চাপ এসে পড়ে—রাতেও এখানে থাকতে হয়—এই সকালের দিকটাতেই তবু একটু হাত খালি থাকে।'

বলতে বলতে সেও সেই পাশের পাথরটাতে জেঁকে বসল।

একটু গল্প করাতে তারও খুব অনিচ্ছা নেই।

আর এদেশে ওর সঙ্গে বসে গল্প করার লোকই বা কৈ, লোভ তো হওয়াই স্বাভাবিক।

কাল রাত্রে আলো-আঁধারিতে ভাল ক'রে লক্ষ্য হয় নি—আজ বেশ ক'রে তাকিয়ে দেখলুম।

লোকটা যে সুপুরুষ তাতে কোন সন্দেহ নেই।

থিয়েটারে বাদশা সুলতান সাজার মতোই।

লোকটা যে বলেছে ইংরেজের রক্ত আছে ওর শিরায়, সেটাও খুব অবিশ্বাস্য মনে হয় না।

পাহাড়ের দুর্দান্ত ঠাণ্ডায় আর কঠিন রৌদ্রে মুখের ও গলার চামড়ায় তামাটে ছোপ পড়েছে—কিন্তু সেই চামড়ারই কুঞ্চনের ভাজে ভাঁজে অথবা গলার খাঁজে যেটুকু মৌলিক রঙ এখনও দেখা যায় তা ইংরেজের মতোই রক্তাভ শ্বেত।

দীর্ঘদেহ, চওড়া কাঁধ—এখন হাড়ের গঠনটাই যা আছে, তবে এককালে যে খুবই চওড়া ছিল তা বেশ বোঝা যায়—এবং ঈষৎ কটা চোখ সেই সাক্ষ্যই বহন করছে।

তবে অবশ্য খাঁটি এদেশী লোক যারা—পুরোপুরি কাশ্মিরী, তাদেরও ইংরেজদের সঙ্গে অনেক সাদৃশ্য আছে।

'শকহূণদল মুঘল-পাঠান—এক দেহে হ'ল লীন'।

সুতরাং ঠিক ক'রে বলাও শক্ত; হয়তো সবটাই গাল-গল্প হ'তে পারে। তেমনি একেবারে অসম্ভব বা অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেওয়ারও কোন কারণ নেই।

সময় অল্প—খোশগল্প জমাতে গেলে হয়তো আসল কথাটা তোলাই যাবে না—আমি আর সে ঝুঁকি নিলুম না।

পকেট থেকে প্যাকেট বার ক'রে একটা সিগারেট আর দেশলাই ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললুম, 'আচ্ছা আলিবক্স, কাল যে কথাটা বললে—আংরেজের খুন আছে তোমার দেহে—তার মানে কী?'

আলিবক্স সামান্য তন্‌খার নৌকর হ'লেও সম্ভবত ভাল জিনিসের দাম জানে।

সিগারেটের প্যাকেটের দিকে চেয়ে ওর দৃষ্টি যেন লুব্ধ হয়ে উঠল, তার ওপর আমার মতো সাহেব তাকে সমান জনের মতো 'সিগারেট মাচিস' এগিয়ে দিচ্ছে—সবটা জড়িয়ে যেন গলে গেল সে।

বার বার সেলাম ক'রে আমাকে ধন্যবাদ জানাতে লাগল, আর বার বারই বলতে লাগল, 'আমি সামান্য নৌকর সাহাব, খানসামা বাবুর্চি, আপনার বান্দার বান্দা—আমাকে যে মেহেরবাণী করলেন তা জীবনে ভুলব না। কিন্তু তাই বলে আপনার সামনে—না হজৌর, এ আমি পরে ধরাব। খাব ঠিকই—এত কিমতী সিগারেট কতকাল চোখেই দেখি নি। পরে একসময় খেয়ে নেব।'

'উঁহু, উঁহু, তুমি কিছুমাত্র সঙ্কোচ করো না আলিবক্স, তুমি সিগারেট ধরাও। তামাক না টানলে গল্প জমে না।

বলতে বলতে আমি দেশলাই জ্বেলে একেবারে ওর সামনে ধরলুম।

'এ তুমি এখন ধরিয়ে নাও, বরং যাবার আগে আরও দুটো দিয়ে যাব এখন, রাত্রে মৌজ ক'রে বিছানায় শুয়ে খেয়ো।

অগত্যা ধরাতেই হ'ল তাকে।

তবে দেখলুম, মুখে যতই যা বলুক—লোকটার ভাবভঙ্গীর মধ্যে এমনই একটা আভিজাত্য আছে যে—ব্যাপারটা কোথাও কিছুমাত্র বেমানান মনে হ'ল না।

আমি তাকে অনুগ্রহ করছি কি সে আমাকে করছে—বোঝা কঠিন।

যে যা-ই হোক, আসল কথাটা জুড়িয়ে যেতে দিলে চলবে না আমার।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাই পূর্ব-প্রসঙ্গের জের টেনে বললুম, 'কৈ বললে না আলিবক্স, আসল কথাটা কী?'

এবার সে যেন একটু গম্ভীর হয়ে গেল।

তবু তখনই কোন উত্তর দিল না। আরও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বসে সিগারেট টানবার পর আস্তে আস্তে বলল, 'কী-ই বা হবে সাহাব সামান্য এক দো-আঁশলা নৌকরের কিস্‌সা শুনে! নিহাতই মামুলী বাত, ঠিক যেমন মামুলী ভেবেছেন তেমনিই। আপনার মতো লোকের শোনার যোগ্য নয়।'

'না আলিবক্স, তোমার চেহারা দেখে আর তোমার কথাবার্তা শুনে আমার অত মামুলী বাত বলে মনে হচ্ছে না। ঠিক সাধারণ দো-আঁশলা ফিরিঙ্গীর ছেলে এমনভাবে কথা বলে না।'

এবার আলিবক্স সোজা চোখ তুলে আমার দিকে তাকাল।

বয়সের জন্যে বা অন্য কারণে ওর চোখের তারার চারিদিকে একটা শ্বেতাভা পড়লেও ছানি পড়া বা ঘোলাটে নয় আদৌ সে চোখ—বরং একটু বেশিই তীক্ষ্ণ মনে হ'ল আমার।

তীক্ষ্ণ আর অন্তর্ভেদী।

বেশ কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'যদি গুস্তাখী বলে মনে না করেন তো একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। সাহাব কি করেন? নৌকরী, না জিমিনদারী আছে বাংলা-মুলুকে?'

'ছটোব কোনটাই খাটল না আলিবক্স। আমি নিতান্তই সাধারণ লোক, কোনমতে কিতাব লিখে দিন গুজরান করি।'

আলিবক্স যেন বিজয়গর্বে মাথা নাড়তে থাকে।

'ম্যয়নে ভি সোহি শোচা থা। কী বলছেন সাহাব; আপনি সাধাবণ লোক—! কত লিখাপড়ি থাকলে তবে মানুষ কিতাব লিখে খেতে পারে!···তা কি লিখেন আপনি, কহানী কিস্সা—না স্কুলী কিতাব?'

'না না। অত বিদ্যে আমার নেই। বানিয়ে বানিয়ে কহানী কিস্সা লিখি শুধু।'

'তাই বলুন! ঠিকই বুঝেছি সাহাব। তাই অত ছোট্ট একটা কথা মনের মধ্যে গিঁট দিয়ে রেখেছেন, ভুলতে পারেন নি। অন্য কোন লোক হ'লে ভাল ক'রে শুনতই না। আর শুনলেও এ নিয়ে মাথা ঘামাত না।'

একটু থেমে আবার বলল, 'তবে আপনিও যেমন ভুল করেন নি, আমিও কিছু ভুল বলি নি। সাধারণ কথাই—নিহায়ৎ মামুলী বাত। মানে অন্য ক্ষেত্রে হ'লে মামুলীই হয়ে পড়ত। তবে মানুষগুলো সাধারণ নয় বলেই একটু যা কথা—আমার দিমাগ থেকেও তাই অহঙ্কারটা যাই-যাই ক'রেও যেতে চায় না। অল্প খোঁচাতেই বেরিয়ে পড়ে। নইলে যা বললুম তা আর এমন ঘমণ্ডের সঙ্গে বলার কথা কি, বরং লজ্জারই তো কথা!'

আবার একটু চুপ ক'রে থেকে সিগারেটে বেশ কয়েকটা সুখটান টেনে বলল, 'আপনি তো বহুত লিখাপড়ি করেছেন, আঠারশ

সান্তাউনে তামাম হিন্দুস্তান জুড়ে যে গদর হয়েছিল—তার কথা নিশ্চয় জানেন?'

'খুব জানি।' আমি উৎসাহিত হয়ে উঠি নিমেষে, 'আমি সে গদর নিয়ে বইও লিখেছি ক'খানা। তবে সে তো অনেকদিন হয়ে গেল—একশো বছুরেরও বেশি। তুমি, তোমার তো অত বয়স নয়! তুমি তখন কোথায়?'

'না হজৌর, আমি তখন জন্মাব'কী!'

সে বোধ করি আমার নির্বুদ্ধিতাতেই খুব খানিকটা হেসে নেয়, 'আমার উমর আপনি কত আঁচ করছেন? না, আমি কেন, আমার বাবজানও জন্মায় নি। আমি বলছি আমার বাবার নানীর কথা। আমার বাবার নানী ছিল আংরেজের মেয়ে—এক বড় জেনারেল সাহাবের মেয়ে, খানদানী মেমসাহাব ছিল। আমার বাবার আপন নানী—পাতানো কি কোন দূর-সম্পর্কের কিছু নয়। গদর না বাধলে, মৌৎ এসে সামনে না দাঁড়ালে সে-সব মেয়ে, আমাদের মতো লোকের ঘরে তাদের জুতোও খোলে না। খুবই খানদানী শরীফ ঘরের মেয়ে। ওর বাবার বাদশাহী খেতাব ছিল, মানে অবিশ্যি আংরেজ মুলুকের বাদশার খেতাব দেওয়া। কী যেন নামটা ভুলে গিয়েছি, হুইল না কি যেন চাক্‌কা—হাঁ হাঁ—হুইলার—সেই জেনারেল সাহাবের নাম ছিল। খুব জবরদস্ত আর নামী সিপাহ্‌সলার ছিলেন—কিন্তু কি করবেন তিনি—নসীব, নসীবে যা লেখা থাকে তা তো আর খণ্ডানো যায় না।...তা সেই সাহাবের রক্ত দেহে আছে বলেই মাঝে মাঝে ঐ মাঘরুরীটা একটু চাড়া দিয়ে ওঠে।'

এই বলে একটু কেমন যেন অপ্রতিভের হাসি হাসল।

সে হাসিতে লজ্জাবোধ নেই তেমন।

অভিজাত বংশীয় লোক যেমন অহঙ্কার প্রকাশ করলে একটা সগর্ব অপ্রতিভতার সঙ্গে হাসে তেমনি।

'তাহ'লে এই যোগাযোগটা হ'ল কি ক'রে? অত বড় শরীফ আদমীর মেয়ের সঙ্গে—?

আরও একটুখানি চুপ ক'রে রইল আলিবক্স।

বলা উচিত কি না তাই ভেবে নিল বোধ হয়।

অথবা স্মৃতি থেকে আহরণ ক'রে ঘটনাগুলো গুছিয়ে নিল মনের মধ্যে।

তার পর বলল, 'আমি তো অত কিছু কিতাব-উতাব পড়ি নি, বাপজান আর আম্মাজানের মুখে যা শুনেছি তাই বলছি। কথাটা ষোরহআনা সাচ কি না তা বলতে পারব না। আমিও জানি না।

'ব্যাপারটা ঘটেছিল কানপুরে। কানপুরে যখন গদর বাধে তখন আংরেজরা বেকুফি করে দরিয়া থেকে অনেক দূরে নিজেদের আড্ডা গাড়ে। ফলে যখন আখেরি হিসেব-নিকেশের দিন এল—তখন আর কোথাও পালাবার পথ রইল না। চুহাকলে যেমন আটক পড়ে চুহারা—তেমনি অবস্থা হ'ল। তেমনিভাবেই মরতে লাগল সব। কেউ না খেয়ে মরল, কেউ মরল রোগের বিনা ইলাজে।'

তার পর সিগারেটটায় একটা শেষ টান টেনে গলা খাঁকারি দিয়ে নিয়ে আবার বলল, 'অবিশ্যি গুলি-গোলাতেই বেশির ভাগ, এক মিনিটের শান্তি দেয় নি তো নানাধুন্ধুপন্থ। বেকুবি শুনবেন সাহাব? একটু জলের পর্যন্ত ব্যবস্থা ছিল না গড়ের মধ্যে, গড়খাইয়ের বাইরে কুয়া—সেখানে থেকে জল আনতেই কমসে কম দো-ঢাইশও আদমী জান দিয়েছে। সেই জন্যেই নাকি নানাসাহাবের ওয়াজীর আজিমুল্লা খাঁ আংরেজদের ঐ আড্ডার নাম দিয়েছিল নাচারগড়।

'কিস্‌সা তো অনেক আছে হজৌর। হাজারো কিস্‌সা।

'তবে একটা কথা পরিষ্কার—সাহাব লোগদের হাল যতই খারাপ হোক, সিপাহীদল ওদের একেবারে খতম করতে পারে নি কিছুতেই। এরা লড়তে জানে, মার খেতেও জানে—এই আংরেজরা। দেখলেন

না—দু-দু'বার জার্মান সাহাবদের সঙ্গে লড়াইয়ে কী মারটা বরদাস্ত করল।

'তা নানাসাহাবও বিস্তর কোশিস করেছিল হুজৌর—শেষে কিছুতেই কিছু হচ্ছে না দেখে এরা—মানে, নানাসাহাবের দল এক মতলব খেলল।

'একজনা কয়েদী-মেমসাহাবকে ভয় দেখিয়ে এদের গড়ে পাঠাল এই খবর দিয়ে কি, এরা যদি টাকাকড়ি আর হাতিয়ার রেখে গড় ছেড়ে চলে যায় তো এদের ওঁরা নৌকো ক'রে ইলাহাবাদ পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে দেবেন—এদের আংরেজ ভাইবেরাদারদের কাছে।

'এটা যে ফাঁদ, ঐ চরম দুশমনির দিনে আংরেজদের সঙ্গে আংরেজদের মিলতে দেওয়া যে নিজেদেরই মৌৎ ডেকে আনা—আর তাতে সিপাহীদের রাজী হবার কোন কারণ নেই, এটা যে কোন অন্ধা আদমীও বুঝতে পারত হুজৌর।

'কিন্তু আংরেজদের তখন এমনই শোচনীয় অবস্থা যে, ওদের আর অত বুঝতে গেলে চলে না, অন্ধার মতোই ওরা সে-কথায় রাজী হয়ে গেল।

'মাঝদরিয়ায় যে ডোবে সে একটা কুটো পেলেও ধরতে যায়—ওদেরও তখন সেইরকম অবস্থা।...

'তবে কি, আমি বলি সাহাব, এইটুকু ভুল না করলে এতটা দুর্দশা হ'ত না—মরতেই হ'ত হয়তো, তবু ঐ গড়ে থেকে মরলে মানুষের মতো জঙ্গী আদমীর মতো মরতে পারত, এমন জানোয়ারের মতো কুত্তা-বকরীর মতো মরতে হত না।

'যাক গে সে-কথা—সে-সব কহানী তো আপনি জানেনই।

'ওরা সিপাহীদের কথা মতো সতীচৌরা ঘাটে গিয়েছিল, নাও ভি তৈয়ার ছিল—কিন্তু সে নাওতে ওঠবার মুখেই—তখনও সবাই ঘাটে পৌঁছয় নি বোধ হয়, এরা শয়তানের খেল শুরু ক'রে দিল।

'পাড়ের ওপর সাজানো ছিল কামান, সিপাহীদের হাতে ছিল

হাজারো বন্দুক। তা ছাড়া খোলা নাও ভাড়া ক'রে তার ওপর খড়ের ছাউনি বানানো হয়েছিল—পাছে ধুপ লেগে মেমসাহাবদের কষ্ট হয়—বুঝতেই পারছেন, গরমের দিনের শুকনো খড়, তাতে আগুন লাগানো তো এক লহমার কাজ।··

'যারা বেইমানীর ফাঁদ বুঝে আবার পাড়ে উঠে আসার চেষ্টা করল তাদেব খুঁচিয়ে মারা হ'ল, যারা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা মরল লাঠিতে কিংবা গুলিতে, হাঁটুভোর জলে নেমে দমাদ্দম লাঠি চালাতে লাগল সিপাহীরা।

'ওরই মধ্যে তিন-চারখানা নাও একটু দূরে চলে যেতে পেরেছিল—এদের গুলিব নাগালের বাইরে—তবে তারাও রেহাই পায় নি।

'বহুদূব পর্যন্ত পিছু নিয়েছিল এরা, শয়তানের বাচ্চাদের খবর পাঠানো হযেছিল, পাড়ে পাড়ে তারা হাতিয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে, কোথাও দিয়ে না পালাতে পারে।'

আবারও একটু চুপ করল আলিবক্স, বোধ হয় দম নিতেই।

'এ তো গেল মরদদের কথা, সব চেয়ে বেহাল হয়েছিল হজৌর ঐ মেমসাহাবদেরই।

'মরেও ছিল অনেকে—তবে যারা মরেছে তারাই আসলে বেঁচে গিয়েছিল সেদিন।

'মানুষের জিন্দিগীতে মরার চেয়েও বুরা জিনিস আছে—তা তো আপনি জানেনই।

'মরার বেশি দুঃখ হ'ল বেইজ্জতীর। যে-সব মেমসাহাবদের ধরে এরা বিবিঘরে কয়েদ ক'রে রাখে তাদের প্রায় সকলকেই শরম ইজ্জৎ ইমান খোয়াতে হয়েছিল। একজনও সে অপমান থেকে রেহাই পেয়েছিল কিনা সন্দেহ।

'অথচ তাতেই কি প্রাণটা বাঁচল ?

'তাও তো না, নানার বাঁধা রেণ্ডী হুসেনা বাঈজী আর তার পোষা এক কসাই মিলে তো সেই সাবাড় করল—মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা

দিয়ে। বালবাচ্চা থেকে ধাড়ি পর্যন্ত একজনও বোধ হয় বাঁচে নি সেদিন—সব ক'টাকেই ঘায়েল করেছিল ওরা।'

আলিবক্স যে নাটকটা ভাল বোঝে তা কাল রাত্রের প্রথম দর্শনেই বুঝেছিলুম।

আজ আরও বুঝলুম।

এবার নাটকীয়ভাবেই, অকারণে গলা একটু নামিয়ে বলল, 'কিন্তু হজৌর, আপনাদের কিতাবে কি লেখা আছে তা জানি না, আমি যা শুনেছি—মেয়েছেলে যারা সেদিন ঘাট পর্যন্ত গিয়েছিল বা যেতে তৈরি ছিল—তাদের সকলে বিবিঘরে পৌঁছয় নি।

'কতক মরেছে ঘাটেই—নাওতে, দরিয়াতে, পাড়ে দাঁড়িয়ে গুলি খেয়ে—কতক দূর দরিয়াতেও মরেছে—আর কতককে বাগে পেয়ে কিছু কিছু সিপাহী লুঠ করেছে।

'হাঁ হজৌর, টাকাকড়ি জেবর জহরৎ যেমন লুঠ হয়—লড়াই গদরে তেমনি আওরৎও কম লুঠ হয় না।

'এ সাহাব চিরকাল হয়ে আসছে—আর হয়তো চিরকালই হবে।

'তবে, লুঠের কথাটা জানাজানিও হয়ে গিয়েছিল। অনেক লোককে নিয়ে অনেক লোকের মধ্যে যে কাজ—তা চাপা রাখাও মুশকিল তো। নানাসাহাবের কানেও উঠেছিল কথাটা।

'তিনি সঙ্গে সঙ্গে হুকুম জারি করলেন যে, যারা যারা এমনি মেমসাহাব কি তাদের আয়াকে নিয়ে গেছে তারা যেন এই ইশতিহার-নামার কথা শোনা মাত্র ঐসব মেমসাহাবদের আওরৎদের এনে বিবিঘরে জমা দেয়। মেয়েদের বেইজ্জৎ করাটা যে কোন শাহীর কলঙ্ক শুধু নয়, তিনি যখন শাহীতক্তে বসেছেন তখন এটা বরদাস্ত করা তাঁর গুনাহ্ হবে।

'সে হুকুমে প্রায় সবাই—যে যা নিয়েছিল ফিরিয়ে দিয়ে গেল—তাদের আর তখন রাখার দরকারও ছিল না, ফুল বাসি হয়ে গেলে কে আর ঘরের ফুলদানিতে রাখতে চায়—তা ছাড়া ঐ গদরের

সময় ঝুটমুট মেমসাহাব পুষতে যাবে কে? হাতী পোষা বৈ তো নয়!

'কিন্তু দু'একজন সে হুকুম ইশতিহাবের কথা শুনেও গ্রাহ্য করল না। আলি খাঁ তাদেরই একজন।...এই আলি খাঁই আমার পূর্ব-পুরুষ হুজৌর, আমার বা'জানের নানা।

'আংরেজদের ভয়ে শেষে নাম পাল্‌টে নিয়েছিল—আখতার হুসেন বলে পরিচয় দিত। কিন্তু সরকারী খাতায় খুঁজলে এখনও আলি খাঁ নামই পাবেন।'

এই পর্যন্ত বলে, বোধ হয় ক্লান্তিতেই, চুপ করল আলিবক্স।

বুড়ো মানুষ, একটানা অনেকক্ষণ বকেছে, ক্লান্তি বোধ তো হ'তেই পারে।

হয়তো এখন একটু বিশ্রাম করতে দেওয়াই উচিত—কিন্তু আমারও আর তখন হাতে সময় নেই।

সাড়ে দশটার মধ্যে ওখানে গিয়ে খাওয়া সেরে বাস-এ উঠতে হবে।...সুতরাং তাড়াতাড়ি আর একটা সিগারেট ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললুম, 'তার পর?'

'বলছি সাহাব। দাঁড়ান। এতই যখন মেহেরবাণী করলেন—আপনার সিগারেটটাও ধরিয়ে নিন। ওঃ, বহুকাল এত কিম্‌তী সিগারেট খাই নি!...

'হ্যাঁ, যা বলছিলুম। আলি খাঁ হুকুম শুনেও এল না, মেয়েটাকেও জমা দিল না।

'সাধারণ কোন মামুলী আদমির মেয়ে হ'লে কেউ মাথাও ঘামাত না, কথাটা ঐখানেই চাপা পড়ে যেত। কিন্তু শোনা গেল যাকে পাওনা যায় নি—সে খোদ জেনারেল সাহাবের খুবসুরৎ মেয়ে এলিস, বসরাই গুল্-এর মতো রূপসী, উনিশ-কুড়ি বছর মোটে বয়স। শাহী-হারেমে রাখার মতো।

'নবাব-বাদশার ঘরে যাকে মানায় তাকে নিয়ে কে পালাল,

সাধারণ নালায়েক এক জুনিয়র অফ্‌সার—কর্তব্য হিসেবে না হোক —হিংসের জ্বালাতেও মানুষ খোঁজ করবে বৈ কি!

'ক্রমে কানাকানি হয়ে আখতার হুসেনের নামও কানে উঠল নানাসাহাবের। তিনি ওকে ডেকে পাঠালেন।

'আখতার হুসেন বা আলি খাঁ যা-ই বলুন, সেও খুব খুবসুরৎ লোক ছিল। এখনকার মাপে নাকি ছ'ফুটেরও বেশি, তাগড়াই জোয়ান—মরদের বাচ্চা মরদ যাকে বলে।

'সে এসে নির্ভয়ে তার জঙ্গী কায়দায় সেলাম ক'রে দাঁড়াল।

'নানাসাহাব বললেন, "এসব কি শুনছি আলি খাঁ, তুমি নাকি জেনারেল সাহাবের মেয়েকে এখনও ফেরত দাও নি?"

'ভয়-ডর জিনিসটা অবশ্য কোনদিনই ছিল না আলি খাঁর—কিন্তু একটা জিনিসকে সব জঙ্গী জোয়ানই ভয় করে, বিশেষ যদি সাচ্চা আদমী হয়—সেটা হচ্ছে বদনামী।

'কিন্তু এতবড় বদনামীতেও আলি খাঁর মুখে একটু আঁধিয়ারীর ছায়া পড়ল না।

'না ফুটল কোন শরম—না ফুটল কোন গুস্‌সা।

সে খুব সিধাভাবেই জবাব দিল, "কোন জিনিস নিলে তবেই না ফেরত দেবার কথা ওঠে পেশোয়া সাহাব, আমি যা নিই নি তা ফেরত দেব কেমন ক'রে?"

'পেশোয়া বলতে গেলেন, "তবে যে ওরা বলছিল—"

'কথা শেষ করার আগেই জবাব দিল আলি খাঁ, "যারা বলছিল তাদের ডাকুন, তারাই খুঁজে বার করুক কোথায় আছে, কার কাছে—আমি এখনই তাকে নিয়ে এসে পৌঁছে দিচ্ছি।"

' "তার মানে তুমি জানো না তার কথা কিছু?" নানাসাহাব শুধালেন।

' "কেন জানব না? খুব জানি।"

' "তা'হলে?"

' "জানা মানেই তো ঘরে কি হাতের মধ্যে থাকা নয় খোদাবন্দ," আলি খাঁ তেমনি উঁচু মেজাজে বাঁকা হাসির সঙ্গে জবাব দিল। ..."জেনারেল সাহাবের লেড়কীকে আপনার চার-পাঁচজন সিপাহী টেনে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে বেইজ্জৎ করেছিল—তাদেব আমি নাম ক'রেই বলে দিচ্ছি, কে কোথায় মুদ্দর হয়ে পড়ে আছে তাও বলে দিচ্ছি—তাদেরই একজন নিয়ে গিয়ে একটা বাড়িতে পুরে রেখেছিল। কোন্ ফাঁকে ছাড়া পেয়ে রাতের বেলা সে ছোকরী ওদের সব ক'-জনকেই খুন করেছে বেমালুম—যে তিনজনকে হাতের কাছে পেয়েছে —তার পর নিজেও কুয়ায় ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে। আপনি সঙ্গে লোক দিলে আমি সে বাড়ি সে কুয়া দেখিয়ে দিয়ে আসতে পারি। ওদের লাশ এখনও সেখানে পড়ে আছে।"

'জবানও যেমন সাফ সাফ আলি খাঁর—চোখের চাউনিও তেমনি সিধা। অবিশ্বাস করার কোন কারণ ছিল না।

'তা ছাড়া তখন অত খোঁজ-তালাশের সময়ও নেই।

'কে করবে—কেন করবে ?

'কত দিকে কত লোক বেপাত্তা হচ্ছে, কোতল হচ্ছে—কে-ই বা তার হিসেব রাখছে ?

'তা ছাড়া বিবিঘর বোঝাই তখন মেয়েছেলে, তাদের নিয়েই কি করা হবে ঠিকানা নেই।...

'নানাসাহাব আলি খাঁর কৈফিয়ৎ মেনে নিয়ে ওকে ছুটি দিয়ে দিলেন।

'আসল কথাটা কি জানেন হুজৌর, আলি খাঁর কথাটার মধ্যে একটুখানি দানাও ছিল। একেবারে সবটাই ফিকা পানি নয়।

'সত্যিই যখন মেয়েটাকে ক'টা রোহিলা সিপাহী টেনে নিয়ে যাচ্ছিল জবরদস্তী জঙ্গলের দিকে তখন আলি খাঁ তা ঠাওর ক'রে তাদের পিছু নেয়।

'তারা দলে ছিল—জন পাঁচ-ছয় হবে, তবে ঐ যা বলেছি ডর শব্দটা আলি খাঁ জানত না।

'যেমন জোয়ান তেমনি দুরন্ত লড়াইদার ছিল শুনেছি—চুলে পাথর বেঁধে দোলালে দূর থেকে পিস্তলের গুলিতে সে চুল কেটে দিত, আবার মানুষের মাথায় আমরুত রেখে তলোয়ার দিয়ে দু'খানা করত —যার মাথা সে টেরও পেত না। এমনি সাফ হাত ছিল।

'তা আগে কিছু বলে নি আলি খাঁ, তাদের বুঝিয়ে বলতে গিয়েছিল, কিন্তু তাদের তখন মাথায় আগ চড়ে গেছে—ভাল কথা কি শোনে?

'আসলে এন্তেকালও ঘনিয়ে এসেছিল আর কি!

'জেনারেল সাহাবের মেয়ের ওপর লালচ করতে গিয়ে জানটাই দিল বেচারীরা—সে লেড়কীর হাতে নয়, আলি খাঁর হাতেই ঘায়েল হ'ল।

সব ক'জনই সাফ হয়ে গেল—ক'টা লহমার মধ্যে।

'হ্যাঁ, তা যা বলছিলুম।

'ঝোঁকের মাথায় কাজটা তো করে বসল—কিন্তু তার পরই বুঝল ব্যাপারটা।

'দায়িত্বটা পুরোপুরিই এসে পড়ল ওর ওপর। বেগতিক দেখে আলি খাঁ রাতের আঁধিয়ারে ওকে নিয়ে গিয়ে কোন এক হোটেল-বাড়িতে, নিচে যে মদ রাখার ঘর থাকে—সেই কামরায় রেখে দিয়ে এল।

'মাথা গোঁজার জায়গা মিলল ঠিকই—তবে খাওয়ার মতো কিছু ছিল না সেখানে। সির্ফ একটু পানি আর কোথা থেকে এক ডেলা গুড় যোগাড় ক'রে দিয়ে এল মেয়েটাকে।

'এলিস নাকি তার পায়ে ধরে তখন কেঁদেছিল যে, যেখানে তার অন্য রিসালাদারদের রাখা হয়েছে—সেই সব মেমসাহাবদের কাছে রেখে আসতে।

'তার জবাবে খুব ঠাণ্ডা হাসি হেসেছিল আলি খাঁ, বলেছিল, "তাদেরও কেউই বাঁচবে না বিবিসাহেবা,—না জানে, না ইজ্জতে। দুটো দিন ছাখো—তা'হলেই বুঝবে। এখান থেকেই টের পাবে—সে জায়গা খুব দূরেও নয়।"

'তা টের পেলও জেনারেল সাহাবের বিটি।

'যেখানে ওকে রাখা হয়েছিল তার কাছেই নাকি বিবিঘর।

'সেখানের কান্নার আওয়াজ ওর সেই মাটির নিচের ঘরেও পৌঁছেছিল। তার পর সেই খুনী-রাত্রেই আলি খাঁর সঙ্গে বেরিয়ে এসে নিজের চোখেও দেখে গিয়েছিল মানুষের শয়তানী আর বদমায়েশীর সেই ভয়ঙ্কর নিশানা।

'যা দেখে নাকি মনে হয়েছিল ওর যে, সেইটেই রোজকিয়ামতের রাত।

'আপনারা - হিন্দু সাহাবরা—যাকে বলেন প্রলযের রাত।

'তার পর—সেই ভয়ানক ব্যাপার দেখে মেয়েটা সোজাসুজি আলি খাঁকেই জড়িয়ে ধরল।

'তা ছাড়া আর ওর মালাজ্-আশ্রয়ই বা কোথা সেদিন!

'আরও একটা কথা ছিল বোধ হয়। চারিদিকে মানুষের লালচের যে চেহারা ক'দিনে দেখল এলিস বিবি, তাতে ক'রে অন্য মানুষের তুলনায় আলি খাঁকে ওর ফেরেশ্‌তা বলে মনে হ'ল।

'যা খুশি করতে পারত ক'দিন আলি খাঁ—হাতের মুঠোর মধ্যেই ছিল বলতে গেলে—কিন্তু কিছুই করে নি, নিজে থেকে গায়ে হাতও দেয় নি কোন দিন। জবরদস্তিতে আদায় করতে চায় নি মুহব্বৎ।

'তাইতেই বোধ হয় মেয়েটার মনের চাকা ঘুরে গেল।

'যার জন্যে এত পুরুষের এত লালচ, জানটাই দিয়ে দিল অক্লেশে, সেই বেহেস্তী গুল নিজে এসে ধরা দিল আলি খাঁর কাছে।

'অবশ্য এই পাওয়াটা খুব সুখের হয় নি—আলি খাঁর।

'ফুল পাথরের মতো পাহাড়ের মতো ভারী বোঝা হয়ে চেপে বসল

জিন্দিগীর মাথায়, কিসমতের মাথায়। না পারে ওকে কোথাও ভরসা ক'রে রাখতে, না পারে নিজেদের ফৌজে ফিরে যেতে—না পারে ঘরে পৌঁছতে।

'টাকা-কড়ি হয়তো প্রথম দিকে কিছু ছিল হাতে, কিন্তু সে আর ক'দিন চলে? রোজগার করবে সে উপায়ই বা কই?

'সঙ্গে ঐ আগুনের মতো খুস্‌মঞ্জর মেয়ে!

'তার পর গদর যখন থেমে এল, আংরেজরা নিজেদের আবার কায়েম করতে লাগল একটু একটু ক'রে—ওরা ইস্তিকামের জন্যে পাগল হয়ে উঠল।

'লোহুর বদলে লোহু নয় শুধু—এক ফোটা বিলায়তী লোহুর বদলে পাঁচশো জোয়ানের লোহু চায় ওরা—লোহুর দরিয়া বওয়াতে না পারলে যেন তাদের তেষ্টা মিটবে না।

'সে সময় আলি খাঁ অবশ্য নাকি অনেকবার বলেছিল যে, "চলো তোমাকে কোন আংরেজের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসি—তুমি তাদের কাছে সাক্ষী দিও যে, আমি তোমার জান আর ইজ্জৎ নষ্ট করি নি, নষ্ট হ'তে দিই নি -তাহ'লেই আমার অব্যাহতি, চাই কি আবার আমি ফৌজে আমার নৌকরী ফিরেও পেতে পারি।"

'কিন্তু এলিস তাতে রাজী হয় নি।

'বলেছিল, "তুমি আংরেজকে চেনো না, আমি চিনি। তুমি কিছু করো নি—বরং আমার শরম আর ইমান বাঁচাতে তোমার দেশো-য়ালীকে কোতল করেছ এ কেউ বিশ্বাস করবে না। আমাকে ফিরে নেবে ঠিকই—কিন্তু তোমাকে রেহাই দেবে না। সামনে পহেলা যে আমগাছ পাবে তাতেই ধরে ফাঁসে লটকে দেবে। দেখছ না ক'দিন নিজের চোখে! তা যদি নাও দেয়—তোমাদের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রাখতে দেবে না, এটা তো ঠিক? এখন আর আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না। আমার জানই বল জিন্দিগীই বল—সব এখন তুমি'।"

এবার একটু থেমে হেসে বলল, 'আওরৎ এমনি হয় হুজৌর। মুহব্বৎ এলে ম্যা বাপ রিস্‌সাদার কারও কথা ইয়াদ রাখে না।

'অবিশ্যি মেয়েটাই একটা ফন্দি বার করল আলি খাঁকে বাঁচাবার, নিজেও বাঁচবার।

'নিজের মুখে হাতে ঘাড়ে রঙ ক'রে নিত কি-সব দিয়ে—যাতে রঙটা অত সাদা না দেখায়।

'এদেশী বেশির ভাগ খেটে-খাওয়া মেয়েদের মতো তামাটে রঙ ক'রে নিয়েছিল।

'তার পর ওর বুদ্ধিতেই আলি খাঁ কোনমতে দিল্লী আম্বালা বাঁচিয়ে পাহাড়ে-পথে এই জম্মুতে পালিয়ে আসে।

'খুবই কষ্ট হয়েছিল নাকি—খাওয়ার কষ্টই বেশ। রোজগার তো ছিল না—মজতুরী করবে কি কোন কাজের চেষ্টা দেখবে—মেয়েটাকে কোথায় রাখে?

'মেয়েটা তখন আলি খাঁর আশনাইয়ে পাগল—সে সব করতে চায়, বলে, "তুমি বসে থাকো, আমি তোমার জন্যে ভিক্ষে করব।"

'কিন্তু মুশকিল, যেমন মরদ তেমনি আওরৎ—এমনই দেখতে ওরা যে, ছেঁড়া ময়লা ভিখিরীর পোশাক পরে থাকলেও লোকে বুঝতে পারে যে, এরা সাধারণ লোক নয়, খানদানী ঘরের ছেলেমেয়ে।

'যাই হোক—এই জম্মুতে এসে ওরা এক বুড়ো ভদ্রলোকের নজরে পড়ে যায়, তিনিই কিছু জমিজমা দেন, এদেশের জমিতে অবশ্য সহজে চাষ হয় না—অন্তত তখন হত না, খুবই মেহন্নৎ করতে হ'ত ফল কি ফসল ফলাতে—তবু মেহন্নতে ওরা তো পিছপা ছিল না—দুজনেই জোয়ান, আলি খাঁ তো বিশেষ ক'রে—নতুন জীবনের স্বাদ পেয়েছে, দুনিয়ার কোন মজতুরীই কঠিন নয় ওদের কাছে—মজবুরী তো নয়ই।

'সেই থেকেই রয়ে গিয়েছে ওরা এখানে।

'আগেই—পথে আসতে আসতে কোথায় একজন মোল্লা পেয়ে সাদী ক'রে নিয়েছিল ওরা।

'ছেলেমেয়েও হয়েছিল নাকি অনেক।

'আলি খাঁর আসল ঘর ছিল নাকি বেরেলির দিকে, বেশ বড়-ঘরেরই ছেলে শোনা যায়—কিন্তু সেদিকে আর ফিরে যায় নি, তাদের কোন খবরও দেয় নি, কোন যোগাযোগও হয় নি।

'খত্‌রাও ছিল খবর দেবার।

'ঐ জেনারেল সাহাবের মেয়েকে নিয়ে ঢের তোলপাড় হয়েছে, বিলায়েত পর্যন্ত নাকি অনেক চেঁচামেচি অনেক লিখাপড়ি হয়েছে—ওরা মরবার ঢের পরে পর্যন্তও নাকি এলিস বিবির খোঁজ করেছে আংরেজ সরকার। আলি খাঁর নামে হুলিয়া বেরিয়েছে গঞ্জে বাজারে। একটু খোঁজ পেলেই চেপে ধরত এসে, আখতার হুসেন নাম দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারত না নিজেকে।

'তবে একটা কথা—কী ক'রে যেন রটে গিয়েছিল যে, ওরা নেপাল মুলুকে চলে গেছে—তাতেই অতটা ঠিক তালাশী হয় নি এদিকে।...

'খোদার মেহেরবাণী হুজৌর। আমার মনে হয় ঐ পাহাড়ী পথে যে এদিকে এসেছিল সেটাই চাউর হয়ে থাকবে। তখন তো পশ্চিমে আসত না কেউ—ফাঁক পেলেই নেপালে পালাত, কেন না ওখানে আংরেজ সরকারের কোন জোর খাটত না, একবার ওখানে পৌঁছতে পারলে নিশ্চিন্তি, লোকে তো বলে নানাসাহাবও নেপালেই পালিয়েছিলেন।

'তাই পাহাড়ে পথ ধরেছে মানেই নেপাল গেছে, সেইটেই ধরে নিয়েছে লোকে।'

আলিবক্সের কহানী শেষ হ'ল এবার।

সে একেবারেই চুপ ক'রে দু'হাতের তেলোয় মুখের দু'দিকের দুই কষ মুছতে লাগল।

আমিও উঠে দাঁড়ালুম।

দশটা বাজে।

শুধু যাওয়া নয় বেশ জোরেই পা চালানো দরকার, নইলে অশান্তির শেষ থাকবে না।

ওরাও হয়তো খেতে পাবে না আমার জন্যে।

আমি প্রতিশ্রুত তৃতীয় সিগারেটটি আলিবক্সকে দিয়ে হন্ হন্ ক'রে হাঁটতে শুরু করলুম 'গেটে'র দিকে।

আলিবক্সও আমার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে এল খানিকটা।

শুনলুম তার গাঁয়ে যাবারও এই-ই রাস্তা, আরও কিছুটা গিয়ে নিচের দিকে নেমে যেতে হয়।

যেতে যেতেই বলল, 'চলুন, আপনাকে পৌঁছেই দিয়ে আসি। কহানীটা যখন শুনলেনই তখন আর একটু বাকি থাকে কেন— শেষটাও শুনিয়ে দিই যেতে যেতে। মামলা কিন্তু ঐখানেই মেটে নি হজৌর।'

'সে কি! তুমি তো বললে তার পর থেকে ওরা এইখানেই ঘর-কন্না পেতেছে—ছেলেপুলে নাতি-নাতনী নিয়ে ঘর করেছে এখানে। সরকারও খবর পায় নি—'

'সরকার খবর পায় নি ঠিকই। কিন্তু খবর একজন পেয়েছিল।

'হজৌর প্রাণের টানে যে খবর নেয়, খোঁজে—সে ঠিক খুঁজে পাবেই।

'এলিস বিবি খুবই খুবসুরৎ ছিল তা তো আগেই বলেছি। ওখানের অনেক ছোকরা অফ্সাররাই ওকে শাদী করার জন্যে বেগানা দেওয়ানা হয়ে উঠেছিল নাকি।

'অবিশ্যি তাদের কারুর সঙ্গেই শাদী দিত না হুইল সাহাব— সাহাব জানত যে, কোনমতে বিলায়েত মুলুকে নিয়ে পৌঁছতে পারলে অনেক লাট-ঘরানার লোক, আমীর আদমী ছুটে আসবে ওকে পাবার জন্যে। তবে সাহাব, আশনাইয়ে যখন পড়ে ছোকরারা, চোখে যখন তাদের মৌতের নেশা ঘনিয়ে আসে, অত হিসেব কে ক'রে?

'এদের মধ্যে নাকি এলিস বিবির কে এক ফুফেরা ভাইও ছিল।

'সেও ঐ ফৌজেরই অফ্‌সার—লিপটিন্যাণ্ট না কি বলে।

'সে তখন কানপুরে ছিল না, নীল সাহাবের সঙ্গেই ইলাহাবাদে ছিল।

'এই নওজয়ান লেড়কী শুধু তার দিলপসন্দ্‌ ছিল তাই না—দিল-কি-রোশনী, জান-কি-রোশনীও ছিল।

'সে অত সহজে হাল ছাড়ে নি। গদর থামতে তার জিন্দিগী তার আখের সব বিসর্জন দিয়ে সেও দিওয়ানার মতো খুঁজে বেড়িয়েছে পথে পথে।

'খুঁজে বারও করেছিল, চার বছর ধরে নাকি এমনি ঘুরেছিল এলিস বিবির খোঁজে—কিন্তু তখন মেমসাহাবের দুটো বাচ্চা হয়ে গেছে। তাও ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল নাকি সেই লিপটিন্যাণ্ট, বলেছিল, "তোমার ও বাচ্চাদের ভারও আমি নেব, আলি খাঁকে ধরিয়ে দেব না—তুমি আমার সঙ্গে বিলায়েত চলে চল।" এলিস বিবি যায় নি, বলেছিল, "এ আমার শৌহর, মনে প্রাণে আমি তাই জানি। এ আমাকে জোর ক'রে ধরে রাখে নি, আমিই রেখেছি। আমার জন্যে বাপ মা ঘরবাড়ি জমি জায়গীর সব ছেড়েছে—আমি এখন ওকে ছাড়তে পারব না। তুমি ফিরে যাও, আমার জন্যে তোমার জিন্দিগী আখের নষ্ট ক'রো না, ভাল দেখে তোমার উপযুক্ত একটি মেয়ে দেখে ঘরকন্না পাতো। তুমি যাকে জানতে সে এলিস বিবি আর নেই—আমার মধ্যের আংরেজ মরে গেছে অনেকদিনই। আমি এখন হিন্দোস্তানের মেয়ে। আমাকে ভুলে যাও।"

'শুধু তাই নয় হজৌর, ওর হাত ধরে—মানে সেই ফুফেরা ভাইয়ের—বলেছিল, "তুমি আমাকে যে মুহব্বৎ করো সেই মুহব্বতের দোহাই—আমাদের ঠিকানা কাউকে দিও না, আমাদের খবর জানিও না।... এটা মনে রেখো যে, আখতার হুসেনের যদি কিছু হয়, ও যদি আংরেজের হাতে ধরা পড়ে, এই পাথরে মাথা ছেঁচে আমি মরব,

আমাকে কেউ রুখতে পারবে না। আমি মরা বাপের নামে, যীশুর নামে কসম খাচ্ছি।"

'তার পর আর সে ছোকরা সাহাব নাকি একটা কথাও বলে নি, মাথা হেঁট ক'রে ফিরে গিয়েছিল। তারও সাচ্চা মুহব্বৎ—তারই ইমান রেখেছিল সে।'

ততক্ষণে ওর বস্তিতে নেমে যাবার পথ এসে গিয়েছে, আরও একদফা 'বহুত বহুত আদাব' জানিয়ে সে দ্রুতপদে নেমে গেল তার পাকদণ্ডী পথে। আমিও হন্ হন্ করে পা চালালুম। এতক্ষণ অবধি আমাকে না দেখে ওরা নিশ্চয়ই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে।

॥ ছয় ॥

অনেকদিন পরে আবার অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হয়ে গেল অবনীবাবুর সঙ্গে। আমাদের নয়, আমার।

গাড়িতে বা গাড়ি উপলক্ষ্য ক'রেও না, এমনিই।

সেবা প্রতিষ্ঠানে এক রোগী দেখতে গেছি—দেখি, ওখানের করিডরে শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছেন ভদ্রলোক।

উসকো-খুসকো চুল, চোখের কোণে কালি—উদ্‌ভ্রান্ত মুখের চেহারা।

অর্থাৎ উদ্বেগের চিহ্ন স্পষ্ট।

উনিও দূর থেকে দেখেছেন আমাকে, চিনতে পারেন নি।

বোধ হয় অতিরিক্ত দুশ্চিন্তায় ডুবে ছিলেন বলেই।

আমি একেবারে সামনে গিয়ে 'কী ব্যাপার, আপনি?' বলে দাঁড়াতেও কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল তাঁর চোখে পরিচয়ের দীপ্তি ফুটে উঠতে।

'ও, এই যে।···কী খবর? এখানে? কার অসুখ আবার? আপনার বন্ধুদের কারও নয় তো?'

কতকটা মুখস্থর মতোই যেন বলে গেলেন।

নিরুৎসুক নিরুৎসাহ কণ্ঠ, ক্লান্ত বিষণ্ণ দৃষ্টি।

অমন ফূর্তিবাজ লোক, ইংরেজীতে jolly good fellow বলতে যা বোঝায়—কেমন যেন বর্ষার মুড়ির মতো মিইয়ে গেছেন।

সংক্ষেপে নিজের কথা বলে আবারও ওঁর খবর জিজ্ঞাসা করলুম, কার অসুখ এবং কী অসুখ।

উনি প্রশ্নটা শুনে একটুখানি চুপ ক'রে রইলেন।

একটু বোধ হয় বিব্রত হয়ে উঠলেন উত্তর দিতে গিয়ে।

অন্তত আমার তাই মনে হ'ল।

তার পর একটু ম্লান হেসে বললেন, 'কার অসুখ সেটা বলাই তো মুশকিল। অসুখ একটি মেয়েছেলের। তিনি আমার কে তা বলতে পারব না। সম্পর্কের সূত্রটা নিজেই ধরতে পারছি না, সেই থেকেই খুঁজছি মনে মনে।'

'কিন্তু অসুখটা কী?'

সম্পর্কটা বলতে যখন ওঁর এত সঙ্কোচ, না-ই বা জিজ্ঞাসা করলুম।

আবারও সেই কুণ্ঠিত হাসি।

'অসুখটাও কি বলতে পারব না। মানে, এখনও স্থির হয় নি। হয়তো এঁরা বলবেন—এক ধরনের ক্যান্সার। আসলে এঁরাও ঠিক ধরতে পারছেন না। জ্বর—অবশ্য সেটা খুব বেশি নয়—তার সঙ্গে হেমারেজ। সেটাও বাইরে তেমন স্পষ্ট নয়, চোখের কোল দিয়ে, দাঁতের গোড়া দিয়ে—পেচ্ছাপ আর পাইখানার সঙ্গে দেখা যাচ্ছে যা—এঁরা বলছেন ভেতরের সমস্ত অর্গ্যানেই রক্তক্ষরণ হচ্ছে। কেন তা কেউ জানেন না এখনও, বুঝতে পারছেন না।···কেউ বলছেন দূষিত কিড্‌নী। কেউ বলছে পচা লিভার। কিন্তু বেশির ভাগই সন্দেহ করছেন ক্যান্সার।'

বলতে বলতেই অবনীবাবুর গলা যেন ভারী হয়ে উঠল।

যে স্ত্রীলোকের সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রটাই ধরতে পারছেন না, তার জন্যে এতটা দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগের কারণ ঠিক বোঝা গেল না।

হোক না কেন মারাত্মক অসুখ!

এমন তো কত লোকের হচ্ছে! তাতে ওঁর কি?

অবনীবাবু মুহূর্ত কয়েক চুপ ক'রে থেকে নিজেকে যেন সামলে নিলেন, তার পর বললেন, 'এঁরা অবশ্য অনেক করছেন। বড় বড় ডাক্তার ছুটোছুটি করছেন, মেডিক্যাল বোর্ড বসে গেছে বলতে গেলে

আমাদের মতো গরীব লোক চিকিৎসার এ সমারোহ ভাবতেই পারি না—কিন্তু কী অসুখ, আর ভাল হবে কি না—সেটা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

তার পর একটু থেমে, কেমন যেন লজ্জা-লজ্জা গলায়, একটু করুণ ভাবে হেসে বললেন, 'বিপদ হয়েছে কি জানেন, আমি আবার সবটা জানিও না। দীর্ঘকাল কোন খবর রাখি না। একটা ওয়ার্কিং গার্লস হোস্টেল মতো আছে গোয়াবাগানে, কী সূত্রে যেন সেখানকার একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়ে মাত্র ক'দিন আগেই এসে উঠেছে ওখানে—কেউ জানে না। বোধ হয় টাকাকড়িও হাতে কিছু ছিল না বিশেষ। খুব বিপন্ন হিসেবেই এই মেয়েটির সাহায্য চায়, মানে একটু আশ্রয়, ক'দিনের জন্যে, সেইভাবে মেয়েটিও দিয়েছিল। এমন ফ্যাসাদে পড়বে জানলে সে দিত না নিশ্চয়ই। এমন বেশি দিনের পরিচয়ও নাকি নয় ওদের।'

এই পর্যন্ত বলে একটু থেমে একটা সিগারেট ধরাবার জন্যেই সম্ভবত, পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাইটা বার করলেন, তার পরই হয়তো মনে পড়ে গেল এটা হাসপাতাল, এখানে ধূমপান নিষিদ্ধ। একটু অপ্রতিভের হাসি হেসে আবার সেগুলো পকেটে পুরলেন।

কিন্তু তার মধ্যেই লক্ষ্য করলুম—ওঁর হাত কাঁপছে।

আপনিই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল প্রশ্নটা, 'তা আপনি এর মধ্যে জড়ালেন কেমন ক'রে ?'

'গেরো—আর কেমন ক'রে!' তেমনিই বিষণ্ণ হাসির সঙ্গে জবাব দিলেন অবনীবাবু, কৃত্রিম উত্তেজনার সঙ্গেই কথাটা বলার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সে উত্তেজনা ঠিক ফুটল না গলায়, 'দু-তিন দিন ওরা এমনিই ফেলে রেখেছিল, তার পর ভয় পেয়ে সেই মেয়েটি—পাঁচজনের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ডাক্তার ডাকে। ডাক্তার এসে অবস্থা দেখে হাসপাতালে পাঠাবার উপদেশ দিয়ে চলে যান।...তৎক্ষণে

রুগী বেহুঁশ হয়ে পড়েছে, তার কাছ থেকে আর কিছু জানার উপায় নেই। ওরা বাক্স-প্যাঁটরা খুলে দেখেছে পয়সা-কড়ি বিশেষ নেই, যা আছে তাতে আজকাল আর কোন চিকিৎসাই চলে না। কোন আত্মীয়স্বজনেরও হদিশ পায় নি, চিঠিপত্র কিছু না—যাতে কাউকে খবর দেওয়া যেতে পারে। এর মধ্যে, ঐ সব কাগজ-পত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটা পুরনো পাস-বই পেয়েছে ব্যাঙ্কের, টাকাকড়ি বিশেষ কিছু ছিল না বলেই বোধ হয়—রিনিউ করানো হয় নি। তবে তার মলাটে নাকি আমার নাম-ঠিকানা লেখা ছিল, একমাত্র যোগাযোগের সূত্র যা পেয়েছে ওরা—তাই আমাকেই গিয়ে খুঁজে বার ক'রে এই খবরটি দিল।...অগত্যা আমাকে যেতে হ'ল—না গিয়ে কি করি বলুন—তিন-চারটে মেয়েছেলে অমনভাবে ছুটে গেছে—গিয়ে দেখি ঐ অবস্থা। হিউম্যানিটেরিয়ান গ্রাউণ্ডেই আরও বুঝলেন না, চলে আসতে পারলুম না। আমার অবস্থাও তো বুঝছেন—তথৈবচ, তবু এখানে এসে সেক্রেটারী মহারাজের হাতে-পায়ে ধরে সেই দিনই ভর্তির ব্যবস্থা করতে হ'ল, য়্যাম্বুলেন্স ডেকে তুলে আনা—সবই। কী আর করি বলুন!'

ব্যাপারটা যে বিশেষ পরিষ্কার হ'ল তা নয়।

কী করবেন না সেটা তো পরিষ্কার—কেন করবেন সেটা যখন জানা নেই, তখন কিছু করতেই হবে তার মানে কী?

যার সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বিশেষ, স্রেফ তার পাসবইয়ের এক কোণে ওঁর নাম-ঠিকানা লেখা ছিল বলেই হিউম্যানিটেরিয়ান গ্রাউণ্ডে তাকে এত কাণ্ড ক'রে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হ'ল—আর না খেয়েদেয়ে ছুটোছুটি করতে হচ্ছে তার জন্যে এতখানি উদ্বেগ একটু অস্বাভাবিক বৈ কি!

তবু, এ প্রশ্ন করা গেল না তখনই।

নিতান্ত অনধিকার চর্চা ভাববেন হয়তো।

তাই মনের কৌতূহল মনেই চেপে রেখে অন্য প্রশ্নে চলে

গেলুম, 'তা এখন এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? দেখা তো হয়ে গেছে!'

আরও বিব্রত আরও যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন ভদ্রলোক।

'হ্যাঁ—তা হয়েছে, তবু—মানে আর কি, ভিজিটিং আওয়ার শেষ হ'লে ডাক্তারদের সঙ্গে দেখা করা যায়—এই মানে অবস্থাটা ঠিক কী রকম ওঁদের কাছে থেকে জেনে নিতে চাই। ওষুধপত্র কী লাগবে না লাগবে—সেও একটু জেনে যাওয়া দরকার।···বলবেন না, ওষুধের যা দাম হয়েছে আজকাল—ফতুর হয়ে গেলুম একেবারে।'

'তা আপনার গাড়ি—?' প্রশ্ন করলুম।

'গাড়ি এর মধ্যে কখন চালাই বলুন? সকাল-বিকেল এখানে খোঁজ নিতেই তো কতটা সময় চলে যায়। মালিক এত লোকসান মানবে কেন?···গাড়ি ক'দিন অন্য লোকেই চালাচ্ছে। সে-ই তো বিপদ, আয় নেই ব্যয় হচ্ছে।'

ব্যাপারটা বুঝলুম না। কথাবার্তাগুলো কতকটা যেন হেঁয়ালির আকার ধারণ করছে।

'রহস্য ক্রমেই ঘনীভূত হইতেছে।' সেকালের গোয়েন্দা কাহিনীর মাঝের এক একটা পরিচ্ছেদের শিরোনামা মনে পড়ে যায়।

নিতান্তই অপরিচিত অথবা সুদূর-পরিচিত একটা মেয়েছেলের জন্য কেউ এতটা করে না।

কোথাও একটা যোগসূত্র নিশ্চয়ই আছে। আবেগের বন্ধন।

কিন্তু কী সে বন্ধন—এখনও সে প্রশ্ন করা গেল না।

এত স্বল্প-পরিচিত আমি, আমার নামটাও বোধ হয় জানেন না ভদ্রলোক—আমার একটা উগ্র কৌতূহল প্রকাশ করা অশোভন।

উনি হয়তো উত্তর দিতে পারবেন না, বিব্রত বোধ করবেন।

তাই এসব প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে বললুম, 'তা তার তো এখনো বিস্তর দেরি, এই তো সবে পাঁচটা। চলুন কোথাও একটু চা খাইগে।

এখানে একটা ভাল দোকান আছে—সিঙ্গাড়া করে খুব ভাল। চা আর সিঙ্গাড়া খাওয়া যাক চলুন।'

অবনীবাবু হাসলেন।

এবার কিন্তু আগেকার কুণ্ঠা বা বিব্রত ভাব নেই।

সহজ প্রসন্ন হাসি।

বললেন, 'চলুন। না বলতে পারছি না। সত্যিই খুব দরকার হয়ে পড়েছে, চা শুধু নয়, একটু কিছু খাওয়াও। ঠাকুর আমার অবস্থা বুঝেই বোধ হয় আজ আপনাকে এখানে আনিয়েছেন। জানেন ভাই, যত দিন যাচ্ছে আমার এই বিশ্বাসটাই বদ্ধমূল হচ্ছে মনে—এ পৃথিবীর কিছুই অকারণে বা আকস্মিকভাবে ঘটে না। এ সবই কারও হিসেব ক'রে ঘটানো—প্রি-প্ল্যান্‌ড্ য়্যাণ্ড প্রি-ডেস্টিন্‌ড্।'

ভাগ্যক্রমে সে সময় দোকানটা বেশ নিরিবিলি ছিল।

চা-সিঙ্গাড়ার অর্ডার দিয়ে আমরা একটা কোণ বেছে নিয়ে বসলুম। অবনীবাবু হাত ধোয়ার বেসিনে গিয়ে মুখে-মাথায়-ঘাড়ে খানিকটা জল দিয়ে এসে নিশ্চিন্ত হয়ে একটা সিগারেট ধরালেন।

এবার হাত অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে দেখলুম, আর অতটা কাঁপছে না।

চায়ে চুমুক দিয়ে একটা 'আঃ' শব্দ ক'রে অবনীবাবু বললেন, 'বাঁচালেন ভাই। এখন ভেবে দেখছি সেই সকালে একখানা টোস্ট আর এক কাপ চা ছাড়া এখনও কিছুই পেটে পড়ে নি।'

'সে কি? কেন? দুপুরে ভাত—?'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান। ভাত খেতে গেলে তো বাড়ি যেতে হবে। সময় কোথা পেলুম?···দুপুরে এখান থেকে রুগীর খবর নিয়ে বেরিয়েছিলুম কিছু টাকা ধারের চেষ্টায়। বুঝতেই তো পারছেন—আমার যা সব বন্ধু-বান্ধব এই লাইনেরই বেশী, তাদের সবাইকারই ধরুন আমার

মতো শানশা অবস্থা। তাদেরই বারোমাস ধার ক'রে চালাতে হয়।···আর যারা আছে জানাশুনো—যাদের অবস্থা ওরই মধ্যে একটু ভাল—তারা আমার মতো লোককে দেবে কেন? কী ভরসায় বা দেবে?···বলতে গিয়ে শুধু শুধু মুখ নষ্ট করা। দু'দলের মধ্যে এই সামঞ্জস্যটাই যে করা মুশকিল। অনেক কষ্টে বিস্তর ঘুরে পঞ্চাশটি টাকা ধার ক'রে নিয়ে আসতেই দেখি চারটে বেজে গেছে।···সেই সকালে বেরোবার পর থেকে চার-পাঁচটা সিগারেট ছাড়া কিছুই পেটে পড়ে নি।'

'তা—মানে--' আমি আর থাকতে না পেরে, কতকটা বিবেচনা-বুদ্ধির দিকে চোখ বুজেই বলে ফেলি, 'আমার হয়তো এসব ব্যাপারে নাক গলানো অন্যায়, অনধিকার চর্চা—এমন কে ইনি যে তার জন্যে—'

স্বাভাবিক কৌতূহলকে আর কত ভদ্রতার লাগামে আটকে রাখা যায়?

'এমনভাবে সর্বস্বান্ত হচ্ছেন! এই তো প্রশ্নটা?'

অবনীবাবুই আমার মুখ থেকে কথাটা কেড়ে নিয়ে শেষ করেন, 'না না, অন্যায়-টন্যায় কেন হবে? এ প্রশ্ন নিজেই তো নিজেকে করছি পঞ্চাশবার। এ তো খুবই রিজ্‌নেব্‌ল্ প্রশ্ন। বলছি।'

পেয়ালার বাকী চা-টুকু শেষ ক'রে আর এক পেয়ালা চায়ের অর্ডার দিলেন অবনীবাবু, ওর মধ্যেই বলে নিলেন, 'আপনি এই সামান্য খরচটুকু মাইণ্ড করবেন না জানি।' তার পর চেয়ারে ঠেস দিয়ে বসে বললেন, 'আমি আপনার মনের কথাটা কি আর টের পাচ্ছি না ভাবছেন? সেই থেকেই ভাবছি আপনি এইবার কথাটা জিজ্ঞাসা করবেন, আপনার ঠোঁটের ডগায় কথাটা এসে ফিরে যাচ্ছে, নিতান্তই ভদ্রতার খাতিরে প্রশ্নটা করতে পারছেন না, এ আমি লক্ষ্য করেছি বৈ কি!'

আমি অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি একটু প্রতিবাদ করতে গেলুম, উনি হাত নেড়ে, খানিকটা হাতে ধরা সিগারেটের ছাই ছড়িয়ে, যেন দৈহিকভাবেই উড়িয়ে দিলেন কথাটা।

'কিছু না, কিছু না। খুবই স্বাভাবিক এটা। আর অনধিকার চর্চাই বা কিসের? আপনি এতটা বন্ধুর মতো দেখছেন—আপনার মহৎ প্রাণেরই পরিচয় এটা,' নইলে আমার আর কি ক্লেম বলুন আপনার এতখানি সহানুভূতি পাবার—সেক্ষেত্রে আমার এই অকারণ দুর্ভোগ কেন—এটা জানতে চাওয়াই অনধিকার চর্চা হয়ে গেল! না মশাই, ওসব বিলিতি ভদ্রতা আমি মানি না, অত সূক্ষ্ম অধিকার-বোধের হিসেবও আমার নেই।···তা ছাড়া কি জানেন, আমারও কাউকে যে কথাগুলো বলা দরকার—এই অদ্ভুত অবস্থাটা নিজের মনেই আর মানিয়ে নিতে পারছি না, কেমন যেন বোকা হয়ে গেছি, মাথাতেও কিছু থাকছে না।'

এই পর্যন্ত বলে থামলেন একটু। বোধ হয় কথাটা কোথা দিয়ে শুরু করবেন তাই চিন্তা করছেন।

তার পর, একটা সিঙ্গাড়া ভেঙে খানিকটা মুখে দিয়ে একটু চোখ টিপে অভ্যস্ত ভঙ্গীতে হেসে বললেন, 'আপনার বন্ধুত্বের ঋণ শোধ হবার নয়—কৌতূহলটা মিটিয়ে দিলে চা-সিঙ্গাড়ার দামটাও যদি শোধ হয়, সেটাও তো দেখা দরকার!'

বুঝলুম পেটে খাবার পড়ার জন্যে যত না হোক সামান্য একটু সহানুভূতির ছোঁয়াতেই অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছেন ভদ্রলোক।

কথাটা বড় বেশী স্পষ্ট এবং একমুখো হয়ে যাচ্ছে দেখে অন্য দিকে মোড় ফেরাবার চেষ্টা করলুম, 'আচ্ছা, সেদিন তো বললেন আপনার স্ত্রী নেই, মারা গেছেন, তা সংসার তাহ'লে কাকে নিয়ে? কে আছেন আর বাড়িতে?'

'সংসার? কে আছেন?···সবাই ছিল। মা-বাবা ছিলেন এই কিছুদিন আগেও। বাবা মারা গেছেন, কিন্তু মা আছেন এখনও, তবে তিনি আমার কাছে থাকেন না—আমার দাদা আছেন দুর্গাপুরে, মা সেখানেই থাকেন। এ ব্যবস্থা অবশ্য বাবা থাকতেই হয়েছে, বাবাও ওখানে ছিলেন শেষ ক'বছর। টালিগঞ্জে আমাদের নিজেদের

বাড়ি, মানে পৈতৃক। বাড়ি সামান্য, পাকা দেওয়াল টিনের চাল—তবে তাতে দাদারও অংশ আছে। তিনি কিছু চান না, কিন্তু আমি দিই। তিনখানা ঘর, দু'খানা আমি ভোগ করি, বাইরের ঘরখানা ভাড়া দিয়েছি। ব্যাচেলার, ভদ্রলোক, আর্টিস্ট, বইয়ের ইলাস্ট্রেশ্যন-এর কাজ করে, বেশির ভাগ, নিজেই রেঁধে-বেড়ে খায়—নির্ঝঞ্ঝাট বলে কম ভাড়াতেই দিয়ে রেখেছি। পঁচিশ টাকা ভাড়া দেয়, সে টাকাটা আমি পুরোই দাদাকে পাঠিয়ে দিই। মানে ভাড়াটেকেই ঠিকানা দিয়ে দিয়েছি, সে-ই প্রতিমাসে মনি-অর্ডার ক'রে পাঠিয়ে দেয়। লোকটা সেদিক দিয়ে খুব ভাল, আজ অবধি একমাসও ভাড়া ফেলে নি। ··ভাড়া ছাড়া ইলেকট্রিক আলো বাবদ মাসে তিন টাকা দেয়—সেটা অবিশ্যি আমি নিই। ইলেকট্রিকের বিল তো আমাকেই দিতে হয়।'

এই বলে আবার একটু চুপ করলেন অবনীবাবু। খাবার চা ঠাণ্ডা হচ্ছিল বলেই বোধ হয়।

আমিও একটু অপেক্ষা ক'রে খানিকটা খাওয়ার সময় দিয়ে আস্তে আস্তে বললুম, 'আপনি খান কোথায়? বাড়িতে আছে কে আর? দেখাশুনো করার লোক?'

'থাকার মতো কেউ নেই, আপনার বলা চলে এমন কোন লোক। লোকের কত কে থাকে, বায়স্কোপের নায়কদের বেলায় দেখি সুবিধে-মতো একটা বিধবা বুড়ী মাসী পিসী ঠিক গজিয়ে ওঠে, ডিরেক্টারদের প্রয়োজন মিটে গেলে আবার তারা কোথায় মিলিয়ে যায়—পরের যে-সব ঘটনা তা দেখে মনেও হয় না যে—এমন একটা লোক সে-বাড়িতে আছে। আমাদের দরকারের সময় কিন্তু অমন একজনও পাই না। ··না, আমার অন্য ব্যবস্থা। একটা ছেলে গাড়ির ক্লীনার ছিল, মানে যতদিন গাড়ি আমার ছিল—ছেলেটার দেশ উড়িষ্যায়, তবে তারও নাকি তিনকুলে কেউ নেই। তাকেই বাড়িতে রেখেছি, খায়-দায় থাকে, সে-ই রান্না-বাড়া করে, ঘর মোছে, বিছানা করে

গিন্নীর মতো—আবার সকালে একফাঁকে গিয়ে খান-দুই গাড়িও ধুয়ে আসে। তাতে ওর টাকা তিরিশেকের মতো হয়—আমার অবিশ্যি বাঁধা কিছু নেই, কোন মাসে দশ কোন মাসে পনেরো—যা পারি দিই। এতদিন বেশ চলছিল, এবার দেখছি—কিছুদিন ধরেই ছোঁড়াটা বেশ চুলবুল করছে। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়স হ'ল তো—বিয়ে করার খুব শখ হয়েছে ; ভাবটা এই, বিয়ে দিয়ে বেটা-বৌয়ের মতো রাখতে পারি তো থাকবে, নইলে একটা লাইসেন্স ক'রে নিয়ে গাড়ি চালাবে, বাসা করবে আলাদা।···কী করব তাই ভাবছি এখন, বিয়ে দিতে পারি, তবে প্রথমত একগাদা খরচ বাড়বে—দ্বিতীয়ত চ্যাঁ-ভ্যাঁ শুরু হয়ে যাবে—বড্ড ঝামেলা। নিজের যখন কিছু নেই পরের আপদ অত জড়াই কেন ?'

বলা শেষ ক'রে হাসলেন অবনীবাবু একটু।

'তা আপনিই বা আবার বিয়ে করলেন না কেন স্ত্রী মারা যেতে ? ক'দ্দিন আগে মারা গেছেন ?···সত্যি কথা বলতে কি, এখনও তো আপনার বিয়ের বয়স যায় নি।'

'স্ত্রী মারা গেছেন একথা আমি তো একবারও বলি নি !' অবনীবাবু তাঁর দ্বিতীয় কাপ চা শেষ ক'রে বেশ নিশ্চিন্তভাবে বললেন, 'আমি বলেছি ঢাকীসুদ্ধ বিসর্জন হয়ে গেছে, সে আর নেই, বিয়ের শখও মিটে গেছে—এই কথাই বলেছি।'

'তার মানে—তিনি বেঁচে আছেন ?'

একটুখানি চুপ ক'রে রইলেন অবনীবাবু। তার পর আস্তে আস্তে বললেন, 'হ্যাঁ। আমি জানতুম না অবিশ্যি, খোঁজ রাখি নি। মাত্র কিছুদিন আগে জেনেছি যে, বেঁচে আছে। তবে না জানলেই ভাল হ'ত বোধ হয়।'

'কেন ?' এ প্রশ্ন এর পর খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু করতে পারলুম না।

প্রশ্নটা মুখ দিয়ে বেরোতে যাচ্ছিল—অতিকষ্টে সামলে নিলুম।

এর মধ্যে যে অত্যন্ত একটা সঙ্কোচের ব্যাপার আছে সেটা স্পষ্ট মিছিমিছি ভদ্রলোককে বিব্রত ক'বে লাভ কী ?

তবে প্রশ্ন করতে হ'ল না। উত্তরটা নিজে থেকেই দিলেন অবনীবাবু।

বোধ হয় আমার নীরব প্রশ্নটা অনুমান ক'রেই।

বললেন, 'সেদিন যে বলেছিলুম গল্পটা, মনে আছে ? সেই যে—একটা লোচ্চা লোক আর একটা মেয়ের কথা ? সেই যে লোকটার কাছ থেকে টাকা আদায় ক'রে মেয়েটাকে দিয়েছিলুম ? আপনাদের মধ্যে কে যেন জানতে চাইলেন যে, মেয়েটা যে পয়সার জন্যেই ঐ লোকটার সঙ্গে এসেছিল সেটা আমি কেমন ক'রে জানলুম—মনে পড়ছে না ? সেই মেয়েছেলেটাই আমার স্ত্রী।'

নাটকীয়ভাবে, কৃত্রিম অনাসক্ত স্বরে কথাটা উচ্চারণ ক'রে, উঁচুদরের অভিনেতার ভঙ্গীতেই যেন একটু থামলেন ভদ্রলোক।

মাত্র কয়েকটি শব্দে যেন সংবাদের একটি বোমা নিক্ষেপ ক'রে চুপ করলেন।

বোধকরি আমার ওপর এই তথ্যটার কি প্রতিক্রিয়া হয় সেটা দেখবার জন্যেই।

তার পর নিজে থেকেই আবার ঐ প্রসঙ্গের সূত্র ধরলেন :

'অন্তত এককালে ছিল। ওর জন্যেই আমার মা-বাবা পর হয়েছেন, ভাই-বোন আত্মীয়-স্বজন সবাই ত্যাগ করেছে। আমি গরীব লোক ঠিকই, টিনের বাড়ির বাসিন্দে, বড়লোক যাকে বলে তা কোনকালেই ছিলুম না—তবু নিঃস্বও ছিলুম না একেবারে। যে গাড়ি নিয়ে ট্যাক্সী চালানো শুরু করি তার প্রথম কিস্তির ছ'হাজার টাকা বাবাই বার ক'রে দিয়েছেন, পরের ইন্‌স্টল্‌মেন্টগুলো অবশ্য আমি শোধ করেছি গাড়ি খাটিয়ে। বাবার টাকাও শোধ দিতে পারতুম, এতদিনে হয়তো আরও একটা ট্যাক্সী করাও অসম্ভব হ'ত না—সে-সব সম্ভাবনা, ভবিষ্যৎ ওঁর পাদপদ্মেই বিসর্জন দিয়েছি। আমি ব্রাহ্মণ, দীর্ঘকালের বাস

আমাদের এখানে, এই কলকাতা শহরে আশেপাশে হাটের ফিরিঙ্গি আত্মীয় আমার—বহু ধনী মান্যমান লোক আমার নিকট-আত্মীয়—আজ সেই আমাকে পঞ্চাশটা টাকা ধার পাওয়ার জন্য সারা দিন না-খেয়ে ছুটোছুটি করতে হয়।…আসলে আমিই পর করেছি সকলকে—ওর জন্যেই। অথচ ওকেও ধরে রাখতে পারি নি।'

কথাটা শুনতে শুনতে একটা কুটিল অনুমান মনে দেখা দিয়েছিল, এখন উনি নিঃশ্বাস নেবার জন্যে একটু থামতেই আমি বললুম—না বলে থাকতে পারলুম না, আরও পরিষ্কার বলতে গেলে বলতে হয়, আমার অজ্ঞাতসারেই প্রশ্নটা বেরিয়ে গেল, 'আচ্ছা, মাপ করবেন, কথাটা জিজ্ঞাসা করা হয়তো উচিত হচ্ছে না—কিন্তু হাসপাতালে যিনি—যার জন্যে আপনি - উনিই কি—'

'হ্যাঁ।' প্রশান্ত মুখে উত্তর দিলেন অবনীবাবু, এর মধ্যে অনেকটা সামলে নিয়েছেন নিজেকে, পূর্বের বেপরোয়া ভাবে অনেকখানিই ফিরে এসেছেন আবার, 'উনিই এককালে আমার স্ত্রী ছিলেন। আইনত হয়তো আজও আছেন। মানে আমাদের ডিভোর্সটা হয় নি। কোন পক্ষেই তেমন গরজ ছিল না বলেই হয় নি—নইলে আমার কোন আপত্তি ছিল না।…সেই জন্যেই তো হয়েছে মুশকিল, ধর্মত না হোক আইনত একটা দায় থেকেই গেছে আমার।'

কথাটা বলে ফেলার পর, আগে যতটা সঙ্কোচ ছিল আর ততটা রইল না।

অনেকটা সহজ শুধু নয়—মনে মনে সুস্থও হয়ে উঠলেন যেন অবনীবাবু।

গোড়া থেকেই খুলে বললেন সব, আনুপূর্বিক।

নিজের জীবন-কাহিনীই যেটা।

কিন্তু সে কাহিনী উপন্যাসেরই মতো

অবশ্য কোন্ জীবনটাই বা সামান্য—উপেক্ষণীয়! ভগবানেরই লেখা গল্প এসব—মানুষের জীবন-কাহিনী।

প্রতিটি মানুষের জীবনই এক একটা অলিখিত উপন্যাস।

অবনীবাবুর বেলায়ই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন?

উপন্যাস তো বটেই, নাটকীয়ও বলা চলে অনায়াসে।

চাকরি-বাকরির চেষ্টা না দেখে অবনীবাবু যে ট্যাক্সী কিনে নিজে ড্রাইভার হয়ে গাড়ি চালাবেন—এ প্রস্তাবে ওঁর বাবা-মা শুধু নন, কোন আত্মীয়ই খুশী হন নি।

তাঁরা গরীব হ'তে পারেন, কিন্তু বড় বংশ তাঁদের, ভদ্রলোকের ঘর—একটা ইজ্জৎ আছে।

ট্যাক্সী-ড্রাইভার—সে গ্র্যাজুয়েটই হোক আর ব্রাহ্মণই হোক—তাকে আত্মীয় বলে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করবে সকলেই।

মানুষের মন—বিশেষ শিক্ষিত বাঙালীর মন এমন—যে ট্যাক্সী-ড্রাইভার মাসে ছ'শো টাকা রোজগার করে—তার থেকে আড়াইশো টাকা মাইনের কেরানীকে তারা অনেক বেশী ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত ভাবে।

ট্রামের কনডাক্টরের থেকে দু'টাকা রোজের কারখানার 'লেবার' বা ষাট টাকা মাইনের বাঙালী-বাড়ির কর্মচারীও জামাই হিসেবে কাম্য অনেক বাপ-মার কাছে।

কিন্তু বাধা ও আপত্তি যতই প্রবল হয়ে উঠেছে ততই জেদ বেড়ে গেছে অবনীবাবুর।

ওঁর দিকেও কিছু যুক্তি ছিল বৈ কি!

আত্মীয়রা কেউ কোন কাজের ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারেন না—আপত্তির বেলায় অভিভাবক সেজে বসেন।

অনেককেই ধরেছেন, অনেককে বলেছেন।

বাবাও বলেছেন কাউকে কাউকে। সকলেই দুঃখিত মুখে নিজেদের অক্ষমতা জানিয়েছেন। এই তো বাজার—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

উনি নিজের চেষ্টায় যে দু-তিনটে চাকরির খোঁজ পেয়েছিলেন, তা সবই সামান্য কাজ—একশো টাকার বেশী মাইনে নয় কোনটার।

ইস্কুল মাস্টারীরও চেষ্টা দেখেছেন। সুবিধে হয় নি। অনার্স নেই, সাধারণ গ্র্যাজুয়েট—চলবে না। তাও বি. টি. হলে চেষ্টা করতেন তাঁরা। যে অফার পেয়েছেন দু-একটা—তাতে সারা জীবনেও দুশো টাকা মাইনে হ'ত কিনা সন্দেহ।

তার চেয়ে এ ঢের ভাল। স্বাধীন কাজ।

তাঁর জানাচেনার মধ্যে যত ট্যাক্সীওলা আছে, কেউ মাসে তিনশো টাকার কম কামায় না।

বেশীও আনে বেশী খাটলে।

তখন বয়স কম, স্বাস্থ্য ভাল—খাটতে পিছ্‌পাও ছিলেন না অবনীবাবু।

খাটতে যে কেন ভয় পায় লোকে তা-ই বুঝতে পারতেন না তখন।···

বাবার মত ছিল না, তবু ছোট ছেলে—দুই বোন এবং দুই ভাইয়ের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ অবনীবাবু—জেদ ধরতে আর 'না' বলতে পারেন নি শেষ পর্যন্ত।

টাকাটা বার ক'রেই দিয়েছেন, তাঁর সর্বশেষ অবলম্বন, অফিসে পাওয়া প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের অবশিষ্ট উদ্বৃত্ত টাকা—ঐ ক'টাই পড়ে ছিল।

বাকী যা মেয়ের বিয়ের দেনা শোধ করতেই চলে গিয়েছে।

এই বাড়িটুকুও বাঁধা পড়েছিল অবনীবাবুর ছোড়দির বিয়ের সময় —সেটা সর্বাগ্রে ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন বাবা।

ভাগ্যে নিয়েছিলেন! নইলে আজ কোথায় দাঁড়াতেন অবনীবাবু?

বাবা আরও আপত্তি করেন নি এই ভেবে যে, ওরাই তো পাবে মরবার পর—এখনই যদি পেলে ওর উপকার হয় তো নিক।

বড় ছেলে সরকারী চাকরি করে, তার জন্য চিন্তাও নেই অত।

তবু তিনি বুঝিয়ে বলতে গিছলেন, 'এই টাকায় অন্য কোন কারবার, দোকানপাট করতে পারিস কিনা ভেবে দেখ না। ট্যাক্সীর একটা অমানুষিক খাটুনিও তো আছে—'

বাধা দিয়ে বলেছিলেন অবনীবাবু, 'ভদ্দরলোকের ছেলে কলেজ থেকে বেরিয়ে ব্যবসা করতে গেল—অনেককেই তো দেখলুম বাবা, সবাই প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে এখন চাকরির চেষ্টায় হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাকী পড়ে আর চুরিতে সব মূলধন শেষ হয়ে গেছে। এ কারবারে বাকী পড়ার কিছু নেই। একার ওপর নির্ভর—চুরি যাবারও সম্ভাবনা নেই। এই তো ভাল ব্যবসা বাবা। এতে অমত করছেন কেন?'

আর কিছু বলেন নি বাবা।

'যা ভাল বোঝ করো' বলে হাল ছেড়ে দিয়েছেন।

প্রথম প্রথম খুব ভালই চলেছিল।

এত ভাল চলবে—স্বপ্নেও আশা করেন নি।

এক একদিন পঞ্চাশ টাকাও কামিয়েছেন। খরচ খরচা-ছাড়াই।

উদ্যমী ও পরিশ্রমী অবনীবাবু দ্রুত দেনা শোধ ক'রে এনেছিলেন।

উদ্যম বরাবরই খুব।

উদ্যম আর উৎসাহ।

আরও ছিল, নিজের পায়ে দাঁড়াবার ও বড় হবার আশা এবং আকাঙ্ক্ষা।

এ-কারবারে তিনি কারও সাহায্য বা সমর্থন পান নি, যা করেছেন নিজেই করেছেন।

নিজেই একদিন মুখ্যমন্ত্রী বিধানবাবুর সঙ্গে দেখা করেছিলেন, তাঁর ভোরবেলা বেড়াতে যাওয়ার সময়।

নিজের পরিচয় দিয়ে ইউনিভার্সিটির কাগজ দেখিয়ে বলেছিলেন —উনি চাকরি চান না, আর্থিক সাহায্য চান না—স্রেফ ট্যাক্সীর পারমিট চান একটি।

নিজেই চালাবেন, লাইসেন্স আছে।

খুশী হয়েছিলেন বিধানবাবু।

তাঁর আনুকূল্যেই অনায়াসে এক পক্ষকালেব মধ্যে পারমিট বেরিয়ে এসেছিল।

অবনীবাবুরও সঙ্কল্প ছিল এর যোগ্য প্রতিদান দেবেন তিনি—এই বিশ্বাস ও সহৃদয়তার ঋণ শোধ করবেন নিজের যোগ্যতা দেখিয়ে।

এই ট্যাক্সীর দেনা শোধ ক'রে আর একখানা গাড়ি কিনে নতুন পারমিটের জন্যে যেদিন যাবেন—সেদিনই বুঝবেন ডাঃ রায় যে, অপাত্রে দয়া করেন নি!

কিন্তু সেটা আব হয়ে ওঠে নি।

বিধানবাবু মারা গেলেন অনেক আগেই।

আর অবনীবাবুরও দেনা শোধ করা হয়ে উঠল না।

বরং এটাও বিক্রী ক'রে দিতে হ'ল—এই গাড়িটাই।

কারণ—

কারণ সচরাচব যা হয়ে থাকে তাই।

সর্বকালে সর্বদেশে বেশির ভাগ পুরুষের অধঃপতনের মূলেই যে কাবণ থাকে।

নারী।

অল্প বয়স তখন অবনীবাবুর, পঁচিশ-ছাব্বিশ বড়জোর, ভাল স্বাস্থ্য, ভূতের মতো খাটছেন।

একদিন অন্তর বিশ্রাম নেবার কথা, তা নেন না।

পরের হাতে গাড়ি ছাড়তেও খুব অনিচ্ছা।

ছ'দিন গাড়ি চালিয়ে রবিবারে রবিবারে বিশ্রাম করেন শুধু।

এক-আধদিন সিনেমাও যান। হয়ত বা খেলাও দেখেন। আড্ডাও দেন একটু-আধটু।

রিক্রিয়েশ্যান বলুন আর বিশ্রামই বলুন ঐ একটা দিন।

এই প্রায়-অবিশ্রাম দৈহিক পরিশ্রমের মধ্যে এক এক সময় মন চায় একটু আনন্দ, একটু কোন স্নেহ-কোমল সাহচর্য।

একটু মধুর সঙ্গ।

হয়তো আরও একটু বেশী।

কী যে—তা পরিষ্কার ক'রে তখনও অবনীবাবু বোঝেন নি।

যাত্রী-বহনের কাজে অনেক মেয়ে দেখেন, না দেখে উপায় থাকে না।

কালো ফর্সা তরুণী কিশোরী পূর্ণযুবতী—সব রকম।

সকলে নয়, কেউ কেউ তাদের মধ্যে মনে ক্ষণিক বিভ্রম, অকারণ অবর্ণনীয় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। স্বাভাবিক সেটা।

কাউকে কাউকে দেখে—সুন্দরী যে হ'তেই হবে তার মানে নেই, কেন সে ধরনের মনোভাব হয়, কী দেখে তা আজও জানেন না অবনীবাবু—দেহের স্নায়ুতে পেশীতে একটা আক্ষেপ অনুভব করেন, একটা কী যেন প্রবল ক্ষুধা, একটা কিসের দুর্নিবার ইচ্ছা।

কাউকে, কোন একটি কোমল দেহকে নিষ্ঠুর নিপীড়নে নিষ্পিষ্ট করার উদগ্র কামনা।…

এটা যে খুব স্পষ্ট, মনের কাছেও স্বচ্ছ—তা নয়।

শুধু এই সময়গুলোতে বড় বেশী অস্থির হয়ে উঠতেন।

ছিটফিটিয়ে বেড়াতেন যেন।

এই মনোভাবের অর্থও যেমন বুঝতে পারতেন না, তেমনি কারণও না।

ঠিক কিন্তু বিবাহের ইচ্ছা বা শখ নয় এটা।

বাড়িতে মা বিয়ের কথা তুললেই হাঁ-হাঁ ক'রে উঠতেন। হেসে উড়িয়ে দিতেন কথাটা।

বিবাহের বিপক্ষে হাজারটা যুক্তি দেখাতেন।

এখন বন্ধনে পড়লে কত অসুবিধা বোঝাবার চেষ্টা করতেন।

এই বয়সে পায়ে বেড়ি পরে উন্নতির পথ বন্ধ করা? পাগল নাকি!

এখন ঘর-সংসার ছেলেপুলে—এসব নিয়ে জড়িয়ে পড়লে আর খাটতে পারবেন না।

দু'খানা গাড়ি করুন আগে, বাড়ির ছাদের টিন নামিয়ে পাকা ছাদ—তার পর বিয়ের কথা চিন্তা করবেন।···

কিন্তু এরই মধ্যে একদিন কিশোর বলে আর একটি ছোকরা ট্যাক্সী-ড্রাইভার এক অদ্ভুত প্রস্তাব করল।

কিশোর ঠিক ওঁর সমবয়সী নয়, দু-চার বছরের বড়ই ছিল হয়তো —তবু তার সঙ্গেই অবনীবাবুর খুব বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। ওঁর মতোই ফুর্তিবাজ, ওঁর মতোই ভদ্রবংশের ছেলে।

ট্যাক্সীর কাজ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে ওঁর আগেকার বন্ধুরা অনেকেই ওঁর সঙ্গে পরিহার ক'রে চলছিল।

সেটা বুঝে উনিও আর সে বন্ধুত্বের দাবী করতেন না, নিঃশব্দে নিজেই সরে আসতেন, সরে থাকতেন।

ক্রমশ ওঁর নিজের লাইনের লোকদের সঙ্গেই অন্তরঙ্গতা হচ্ছিল।

এই-ই নিয়ম, এটা হ'তে বাধ্য।

নতুন বন্ধুত্ব। নতুন প্রীতির বন্ধন।

সেই বন্ধুদের মধ্যেই কিশোর একজন।

ছোকরার গুণ অনেক, কিন্তু প্রবল দোষও ছিল একটা।

সে দোষ স্ত্রীলোক-ঘটিত।

তখন জানতেন না, পরে শুনেছিলেন।

ঐ বয়সেই দুটি সংসার করেছিল সে, দুটি বৌ দু'জায়গায় থাকত। যখন যার কাছে ইচ্ছে গিয়ে ঘর করত।

আরও নাকি ছিল। বিয়ে করাও নয়—তবে বৌ বলে পরিচয় দিত তাদেরও।

কী ক'রে যে চালাত এতগুলো সংসার তা সে-ই জানে।

অবনীবাবু আজও তা ভাল বুঝতে পারেন না।

যতই রোজগার করুক—নিজের গাড়িও নয়, দৈনিক ত্রিশটাকার কড়ারে গাড়ি নিয়ে ভাড়া খাটানো—তাতে দু'তিনটে সংসার চালানো সম্ভব নয়।

পরে একটা আভাস পেয়েছিলেন অবনীবাবু, প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু নয়, অনেক সময় তথাকথিত ঐ বৌগুলোই নাকি চালাত তাকে। টাকা তারাই আনত।

এই কারণেই নাকি এত সংসার রাখা।···

দরকার-মতো তাদের দিয়ে রোজগার করানো চলত বলেই।

সে যা-ই হোক—এসব কথা শুনেছেন অনেক পরে।

তখনও পর্যন্ত দুটি সংসারের কথাও জানতেন না।

কিশোরের দিলখোলা বেপরোয়া স্বভাবের জন্যে বড় প্রিয় ছিল সে অবনীবাবুর।

এ প্রস্তাবের মধ্যে কিশোরের যে কোন দুরভিসন্ধি থাকতে পারে তা তিনি কল্পনাও করেন নি।

কিশোর বলল, 'এই, একদিন একটু ইয়ে করবি? একটা রবিবার? ফূর্তি ঠিক বলব না, ওটা খারাপ কথা—শুধু একটু ইয়ে করা—মনের ঝিঁঝিঁ ছাড়ানো আর কি!—একভাবে বসে থাকলে পায়ে ঝিঁঝিঁ ধরে জানিস তো—মনেও তেমনি লাগে—বারো মাস চৌপর দিন একঘেয়ে কাজ ক'রে গেলে। তাই বলছি—খারাপ কিছু নয়, মাগীবাড়ি যেতে কি রেস খেলতে কি মদ খেতে বলছি না।'

'তবে?' অবনীবাবু হেসে জবাব দিয়েছিলেন, 'কী করতে বলছিস চট ক'রে সেইটেই বলে ফেল না! কী বলছিস না সেটা এতক্ষণে বুঝে নিয়েছি।'

বলেছিল কিশোর, বেশ বিস্তারিতভাবেই বলেছিল।

শব্দচয়ন ও কণ্ঠস্বরে বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়েই।

জাছুর জাল বুনেছিল।

হয়ত—আজ মনে হয়—অবনীবাবুর মনের ক্ষেত্র অনেকটা প্রস্তুত ছিল বলেই সেটা সম্ভব হয়েছিল।

তিনিই এগিয়ে ছিলেন ঐদিকে মনে মনে।

কিশোরের প্রস্তাবটা খুব স্পষ্ট নয় অবশ্য।

একটি সম্ভ্রান্ত রিফিউজী ফ্যামিলির মেয়ে—অন্ধ বাবা, পাগল মা, আর পাঁচ ছ'টি ভাইবোনের একমাত্র অভিভাবক বলতে গেলে।

লেখাপড়া করে নি বিশেষ ; মানে, হয়ে ওঠে নি।

তাই অন্যভাবে উপার্জন করতে হয়—এতবড় সংসার শুধুই পাঁচ-জনের দাক্ষিণ্যে চলা সম্ভব নয় তো।

অথচ ঠিক মেয়েদের অন্যভাবে রোজগার করা যাকে বলে ওদের সংসারে তা হবার উপায় নেই।

মেয়েটার বাবা যদি টের পায় তো আগে মেয়েকে খুন করবে, তার পর নিজের গলায় কোপ বসাবে।

তা হবে না, বাড়িতে নিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়—সে আসতে পারে।

অবনীবাবু যদি কুড়িটা টাকা দেন তাহ'লে বিকেলে বা সন্ধ্যেয় ছু-তিন ঘণ্টা তাকে নিয়ে যেখানে খুশি যেতে পারেন।

আবার তাকে তার পর বাড়ির কাছাকাছি···বাড়ি যাওয়া চলবে না, গলির মোড় পর্যন্ত গেলেই চলবে—পৌঁছে দিতে হবে।

'কুড়ি টাকা!' অবনীবাবু বলেছিলেন, 'বলিস কী! শুনেছি, যারা ওপাড়ায় যায় তাদের মুখে, পাঁচ টাকায় ভাল মেয়েমানুষ পাওয়া যায়, পুরো একটা রাত কনট্র্যাক্ট।'

'সে তো বাজারের খান্‌কী। তার সঙ্গে এর তুলনা! ল্যাংড়া আমে আর আমড়ায়?'

'নে নে, রাখ। বাজারে যে বেরোয়, টাকা পেলেই যে যায়—সে আবার বাজারের মেয়েছেলে ছাড়া কী?'

'বাজারে বেরোয় বলছিস কী! কুড়ি টাকা দু'তিন ঘণ্টার জন্যে ক'টা লোক খরচ করতে পারে বল দিকি? তাছাড়া যারা ঠিক সেভাবে চাইবে তারা ঘর চাইবে, নিরিবিলি চাইবে, শুতে চাইবে। এ তো ধর —তুই কোথায় আর নিয়ে যেতে পারবি—লেকের ধারে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে কিংবা বড়জোর সিনেমায়! এখন তো এইটেই হয়েছে নোচ্চাদের বড় অসুবিধে। এক এক ঘরে সাতজন থেকে সতেরোজন লোক বাস করে বাড়িতে। বাইরে লেকের ধার থেকে গঙ্গার ধার সর্বত্র ভীড়। মানুষের অসভ্যতা করার ইচ্ছে থাকলে—উভয়পক্ষ রাজী থাকলেও করার উপায় নেই। আজকাল এইজন্যে হোটেল রেস্টুরেণ্ট অন্ধকার করার রেওয়াজ হয়েছে। কিন্তু তাতে কি হয়—কতটুকু হয়? আগে ক'টা হোটেল ছিল, তারা দু-তিন ঘণ্টা বা এক ঘণ্টার জন্যে ঘর দিত—পুলিসে উস্তম-খুস্তম করায় তারা ও লোভ সামলেছে। না না, সে রকম কিছু নয়। এ একটু এমনিই, কাছে থাকবে, মিষ্টি কথা বলবে, হয়তো হাতটা ধরলি কি একটু জড়ালি—এর চেয়ে বেশী কিছু করা চলবে না। কাউকে করতে দেয়ও না বেশী কিছু, সেদিকে মেয়েটা খুব কড়া।'

তারপর বলেছিল কিশোর, কণ্ঠস্বরে আরও লোভের সুর টেনে এনে—'আমি বলছি এ অন্য জিনিস, তুই যা ভাবছিস তা নয়। আমার কথাটা শুনে ছাখ। কুড়ি টাকা তোর কাছে কিছুই না, হাতের ময়লা। খুব ভাল একটা অভিজ্ঞতা হবে, ভাল লাগবে তোর - আমার কথাটা বিশ্বাস কর। আর একটা দুঃস্থ ফ্যামিলিকে সাহায্য করাও তো হবে!'

তবু সহজে রাজী হন নি অবনীবাবু।

এ বিষয়ে ওঁর সহজাত একটা সঙ্কোচ ছিল, জন্মগত সংস্কারের বাধা।

ভদ্র পরিবার, বড় বংশ, লেখাপড়াও যে একেবারে শেখেন নি তা নয়।

আর তখনকার লেখাপড়া অন্য রকমের ছিল, অনেক বিধি-নিষেধ আরোপ করত জীবনে, এখনকার মতো বেপরোয়া ক'রে দিত না।

তখনকার দিনে, মানে শুধু বাবা-মার আমলে, জীবনের মূল্যবোধও ছিল অন্য রকম।

ইচ্ছামতো ভোগ করাতেই যে জীবনের পরম সুখ—একথাটা তাঁরা মানতেন না। সে শিক্ষাও দেন নি।

কিন্তু কিশোরও সহজে হাল ছাড়ে নি।

অনেকদিন ধরে ভুচুং দিয়েছে, বিস্তর মিথ্যা বলেছে, মধুর মিথ্যার মায়াস্বর্গ রচনা করেছে ওঁর কল্পনায়।

'আসল কথা—আজ আর মিথ্যে বলব না আপনার কাছে', বললেন অবনীবাবু, 'আমার মনও নিশ্চয় কতকটা ঐদিকেই এগিয়ে ছিল, আমার—যাকে বলেন আপনারা সিস্টেম—দেহ ও মন মিলিয়ে যে যন্ত্রটা—সেটাও চাইছিল একটি অল্পবয়সী মেয়ের সঙ্গ। তা না হ'লে দশটা কিশোরের ক্ষমতা ছিল না এমন প্রস্তাব পাড়ে আমার কাছে বা রাজী করায়। শুধু শুধু তার দোষ দেব না, আমি ঐদিকে তৈরী হয়ে আছি দেখেই সে হাত ধরে টেনেছিল।'

যাই হোক শেষ পর্যন্ত অবনীবাবু রাজী হলেন।

ওঁরই গাড়ি নিয়ে গিয়ে কিশোর নিয়ে এল মেয়েটাকে।

লেকের ধারে নিরিবিলি জায়গা পাওয়া দায়, তবু আর কোন জায়গাও মনে পড়ে নি।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে আরও ভীড়, গঙ্গার ধারে বসবার জায়গা নেই—দক্ষিণেশ্বর অনেক দূর হয়ে যায়।

তাছাড়া সে জায়গাটা 'একটু অন্যরকম'—অবনীবাবুর মতে। যে যা করে করুক, উনি তাকে অপবিত্র করতে চান নি।

সুতরাং খুঁজে খুঁজে লেকেরই এক প্রান্তে অপেক্ষাকৃত নির্জন জায়গায় গিয়ে বসেছিলেন অবনীবাবু, সেখানেই কিশোর এনে পৌঁছে দিল।

তারপর সে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল, বলে গেল ঘণ্টা দুই পরে এসে ওদের তুলে নেবে আবার গাড়িতে।

খুবই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি।

এ ধরনের কোন অভিজ্ঞতাই কখনও হয় নি অবনীবাবুর এর আগে।

অপরিচিত তরুণী মেয়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য।

কোন ধারণাই নেই, তাই কী করা উচি , কিভাবে য়্যাপ্রোচ করবেন।

উনি তো ঘামতে লাগলেন বসে বসে।

বাঁচিয়ে দিল মেয়েটিই।

সে-ই প্রথম আড়ষ্টতা ভেঙে সহজ ক'রে নিল পবিস্থিতিটা।

নিজে থেকে কথা বলে অবনীবাবুব সঙ্কোচটা কাটিয়ে দিল।

হয়তো সে ওঁর মতো আনাড়ী অনভিজ্ঞ নয়।

সেটা তখন বুঝতে পারেন নি, এখন বোঝেন।

সে যে ইচ্ছা ক'রেই তাঁর সঙ্কোচ ভাঙাল তাও বুঝতে পারেন নি।

লজ্জা দূর হতে এবার অবনীবাবু তাকিয়ে দেখলেন ভাল ক'রে।

না, অপরূপ সুন্দরী কিছু নয়।

উজ্জ্বল-শ্যাম বর্ণ, মুখ-চোখেও কোথাও কোন অসামান্যতা নেই।

খুব ঘন কালো চুল, খোঁপা বাঁধে নি, এলিয়ে পড়ে আছে প্রায় সারা পিঠটা ঢেকে।

এমন কিছু লক্ষ্য করার মতো নেই—তবু কী যেন ছিল মেয়েটার মধ্যে, দেখে ভাল লাগল।

কেমন একটা সুকুমার ভাব, নরম নরম, মুখের ডৌলটার সঙ্গে ঘাড়ের ভঙ্গি মিলিয়ে কোথায় যেন একটা মোহের সৃষ্টি করে।

একহারা চেহারা—তবু কাঠির মতো রোগা নয়, ওরই মধ্যে গোলালো গঠন, মাংসের আভাস আছে।

আসলে, পরে বুঝেছিলেন অবনীবাবু, চোখ দুটিই ওর বড় সুন্দর, দেহের কোন ত্রুটি দেখার অবসর দেয় না সে চোখের দৃষ্টি।

খুব যে আয়ত বা বড় চোখ তা নয়—চাহনিটাই ভাল, চোখে চোখ পড়লে যেন নেশা লাগে, মাদকতার সৃষ্টি করে।

মেয়েটির নাম ছন্দা। ছন্দিতাই রেখেছিলেন মামা, সংক্ষেপিত হয়ে ছন্দায় দাঁড়িয়েছে।

নামের সঙ্গে দেহসুষমারও বোধ কবি মিল আছে—মনে হয়েছিল অবনীবাবুর। ছন্দেবাঁধা একটি মিষ্টি কবিতার মতোই।

বাবা-মার গল্প করল মেয়েটি।

দেশ থেকে পালিয়ে এসে একমুঠো ভাতের সংস্থান করতে কত চেষ্টাই না করেছেন বাবা।

শেষে তিন-চার জায়গায় টিউশানী ক'রে কোনমতে চালাচ্ছিলেন — ব্লাডপ্রেসার বেড়ে চোখ দুটো নষ্ট হয়ে গেল, কিছুই করার ক্ষমতা রইল না।

আগে বসে বসে বিলাপ কবতেন, এখন দিনরাত খিটখিট করেন, ভাল খাবার জন্যে আবদার করেন—এইটুকু মেয়ে কোথা থেকে কী জোটাবে তা ভাবেন না।

অথচ তিনি জানেন, যা কিছু করতে হয় এই মেয়েকেই—যার সম্ভ্রম ও চরিত্র সম্বন্ধে নাকি অতিমাত্রায় সচেতন তিনি।

এইসব দুঃখ-কষ্টে মা পাগল হয়ে গেলেন।

তাঁকে নিয়েই হয়েছে বেশী বিপদ।

ভয়ঙ্কর, দুর্দান্ত পাগল।

চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই করতে পারে নি ওরা। কে ধরাধরি করবে, কে নিয়ে যাবে পাগলা-গারদে?

বস্তির মধ্যে দু'খানা ঘর নিয়ে থাকে ওরা, খুপরি খুপরি এতটুকু ক'রে ঘর—তার একটায় তাঁকে চাবি দিয়ে রাখতে হয়—আর একটায় ওরা দু'টি প্রাণী থাকে।

পাঁচ ভাই-বোন আর বাপ।

সকালে একবার ক'রে যখন মা-র ঘর পরিষ্কার করতে যায় তখন বোন-ভাইদের গিয়ে দাঁড়াতে হয় দরজা আগলে, নইলেই পালাবে।···

ওর পরে যে বড় ভাইটা, আঠারো-উনিশ বছরের ছেলে—সে কাজকর্ম অনেক খুঁজেছিল, কোথাও কিছু যোগাড় করতে না পেরে মাস চারেক আগে কোথায় পালিয়ে গেছে—তার আর কোনও পাত্তা নেই।

তারও কোন খোঁজখবর করা সম্ভব হয় নি ওর পক্ষে।

কে কী করবে, কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে গেলে পয়সা লাগে। কে দেবে অত টাকা ?

এমনিই তো সম্পূর্ণ, বলতে গেলে ভিক্ষার ওপর ওদের সংসার চলছে।

ঐ বস্তির লোকেরাই যে যা পাবে সাহায্য করে—কিন্তু তাদেরই বা সাধ্য কতটুকু ?

তাদেরও আয় সীমিত, ব্যয় সীমাহীন।

তবু যে তারা করে এইটেই আশ্চর্য।

তাদের সেই বহু দুঃখের উপার্জনে ভাগ বসাতে মাথা কাটা যায় ছন্দার। উপায় নেই বলেই প্রতিদিন সেই অপমান দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করতে হয়।

বলতে বলতে ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেলল ছন্দা।···

সুন্দর চোখে মুক্তাবিন্দুর মতো জল।

সুডৌল সুছন্দ ললাটে অপূর্ব স্বেদবিন্দু।···

কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল অবনীবাবুর।

তিনি সান্ত্বনা দেবার অন্য কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে—এতক্ষণ যা পারেন নি—ওর একটা হাত ধরে ঈষৎ চাপ দিলেন।

মেয়েটি হাত সরিয়ে নিল না, বরং একটু পরে আর-একটু কাছ ঘেঁষে বসল।

অর্থাৎ ইচ্ছা করলে অবনীবাবু আরও ঘনিষ্ঠ হতে পারেন, ওঁর মতো ক'রে যা খুশী 'সান্ত্বনা' দিতে পারেন—সেই অবসর দেবার জন্যেই।

সেটা তখন বুঝতে পারেন নি অবনীবাবু।

বুঝতে পারেন নি আরও অনেক কিছুই।

বুঝেছিলেন বা জেনেছিলেন এর পরে।

বেশ কিছুদিন পরে।

জেনেছিলেন, ওঁর করুণা উদ্রেকের জন্যে যা বলেছিল ছন্দা—তা সত্য-মিথ্যায় মেশা।

বাবা অন্ধ এবং মা পাগল ঠিকই --কিন্তু এতটা অসহায় নয়।

বাবা বসে হাতড়ে হাতড়ে ওদের বাসন মেজে দেন, কুটনো কুটে দেন, অবসর সময় ঠোঙা গড়েন। মা-ও দুর্দান্ত পাগল কিছু নয়। গুম খেয়ে বসে থাকেন বেশির ভাগ সময়, তবে কাজকর্ম করতে বললে করেন—ঘরদোরও নোংরা করেন না।

এবং ওর পরের ভাই অজিতও না বলে পালিয়ে যায় নি।

বরানগরে এক রেশনের দোকানে মাল ওজন করার কাজ নিয়েছে—যাতায়াত করা সম্ভব নয় বলে সেখানেই মালিকের বাড়িতে থাকে, খায়।

তিনি খোরাকীর টাকা কেটে নেন বলে বেশী কিছু পাঠাতে পারে না—নিজের খরচ বাদে যা পারে পনেরো-বিশ টাকা প্রতিমাসেই এসে দিয়ে যায়—দোকান বন্ধের দিনগুলোয় বাড়িতেও আসে।

অবশ্য আজ বোঝেন অবনীবাবু--এ ধরনের মিথ্যা না বলে উপায়ও ছিল না।

যা অবস্থা তাতে এই সব সামান্য আয়ে কুলোয় না সত্যি সত্যিই। বাইরে থেকে ঐ মেয়েটাকেই যখন আনতে হবে ; এইভাবেই আনতে হবে—তখন, সেক্ষেত্রে একটু রঙ দিয়ে বাড়িয়েও বলতে হবে।

বিশেষ অবনীবাবুর বেলায় তো আরও।

অবনীবাবু কি ধরনের লোক, 'মাগীবাজ' বা লম্পট নন আদৌ, এখনও পর্যন্ত স্ত্রীলোক সম্বন্ধে ওঁর কোন অভিজ্ঞতাই হয় নি—এটা ছন্দাকে বুঝিয়ে শিখিয়ে দিয়েছিল কিশোর যে, দেহের আকর্ষণে নয় করুণার উদ্রেক ক'রে ভোলাতে হবে ওঁকে।

এসব কথা পরবর্তীকালে ছন্দাই বলেছিল ওঁকে।

অবনীবাবু ভুলেও ছিলেন।

বেশ ভালরকমই ভুলেছিলেন।

এর পর থেকেই শুরু হল তাঁর গোপনে ছন্দাদের সাহায্য দেওয়া।

'মানে', অবনীবাবু অপ্রতিভ বিষণ্ণ হাসি হেসে বললেন, 'পরকালটি আগে খুইয়ে বসে রইলুম। টাকা যা জমছিল এতদিন, যা জমবার কথাও, সেটা বন্ধ হয়ে গেল। যেদিন যা হাতে আসে এক সময় গিয়ে ছন্দার হাতে দিয়ে আসি। কোন হপ্তায় কুড়ি—কোন হপ্তায় তিরিশ। কখনও কখনও আরও বেশী। আগে আগে হাতে ক'রে ভিক্ষের মতো তুলে দিতে লজ্জা করত—কিশোরকে দিয়ে দেওয়াতুম। তারপর টের পেলুম সে ব্যাটা দস্তুরী মারছে, আর সে দস্তুরীর পরিমাণটা বেড়েই যাচ্ছে দিন দিন। আমি তিরিশ টাকা দিলে কুড়ি টাকা মেয়েটা পায়, দশ টাকা কিশোরের পকেটে ওঠে। সন্দেহ একটা ছিলই, মেয়েটাকে একদিন জিজ্ঞাসা করতেই ধরা পড়ে গেল। তখন ও-ই বললে, "যা দেবার আমাকেই দেবেন সরাসরি। নিচ্ছিই তো ভিক্ষে, সাহায্যই বলুন আর যা-ই বলুন—ভিক্ষে ছাড়া তো কিছু নয়—সকলের কাছেই হাত পেতে নিতে হচ্ছে, আপনার মতো লোকের কাছ থেকে নেব তাতে আর লজ্জা কি"।'

সেই থেকে অবনীবাবু ওর হাতেই দিয়ে আসতেন, ভাড়া নিয়ে যাতায়াতের পথে—ঐ দিকে যাওয়ার দরকার হ'লে একমিনিট গাড়ি থামিয়ে বস্তিতে গিয়ে দিয়ে আসতেন।

সব সময় ছন্দা থাকত না, পরের বোন নন্দার কাছে রেখে আসতেন।

ছন্দাই বলে দিয়েছিল, 'ওর কাছে স্বচ্ছন্দে দিতে পারেন, খুব হুঁশিয়ার আর হিসেবী মেয়ে।'

এই যে ছন্দা থাকত না বাড়িতে—মধ্যে মধ্যেই দেখা পেতেন না অবনীবাবু, এর ওপর কোন গুরুত্ব আরোপ করেন নি কখনও, এ অনুপস্থিতির কোন বিশেষ অর্থ আছে মনে করেন নি।

এমন কি বিকেল বা সন্ধ্যার দিকে এলে যে একদিনও দেখা হয় না—এরও কোন কদর্থ মাথায় যায় নি।

আসলে ওঁর মনে মেয়েটি সম্বন্ধে যে স্বপ্ন-কল্পনা রচিত হয়েছিল, তার মূলে প্রায় সবখানিই ছিল সহানুভূতি।

সে সহানুভূতি একটি সুকুমার-চরিত্র মেয়ের নিদারুণ অসহায় অবস্থা কেন্দ্র ক'রেই।

সেখানে কোন সত্যিকারের পাপ বা অনাচার কল্পনা করা যায় না।

'অকস্মাৎ একদিন সে অর্থটা আপনিই প্রকাশ পেল।' অবনীবাবু বললেন, 'কথাটা শোনা ছিল এত দিন, কখনও দেখি নি, মানে চোখে পড়ে নি। লিণ্ড্‌সে স্ট্রীট, নিউ মার্কেট বা সাহেবপাড়ার সিনেমাগুলোর সামনে আগে য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েগুলো ঘুরত—তাদের টাউটের কাজ করত ভাড়াটে গাড়ির গাড়োয়ান বা ঐ ধরনের বিহারী মুসলমানরা, তারাই অবার নেকেড্ ছবি বেচে দু'পয়সা রোজগাব করত, পুরুষের কামনাও উত্তেজিত করত।···

'এখন য়্যাংলোরা নেই, সে জায়গা বাঙালী মেয়েরাই নাকি দখল করেছে। কলেজের মেয়ের মতো ব -খাতা হাতে বা ভ্যানিটি ব্যাগ নিয়ে আধুনিকার দল ঐ সব জায়গায় ঘোরে, কিংবা কারও জন্যে যেন অপেক্ষা করছে এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।

'জানতুম এখনকার বই-টই পড়ে, নিজের চোখে দেখি নি।

সেকেণ্ড হ্যাণ্ড নলেজ যাকে বলে। হঠাৎই একেবারে যেন জানাটা হুড়মুড় ক'রে ঘাড়ে এসে পড়ল।

'সেদিন ঐ নিউ মার্কেটের সামনেই আস্তে আস্তে গাড়িটা চালাচ্ছি—রাত তখন আটটা হবে, সিনেমাগুলো ভাঙে নি, বাজারের ভীড়ও কমে এসেছে, যদি কোন খদ্দের পাই এই আশায়—অকস্মাৎ একটা মেয়ে যেন আছড়ে পড়ল এসে গাড়ির ওপর, "আমায় বাঁচান, দুটো গুণ্ডা পিছু নিয়েছে"—

'গলার আওয়াজটা চেনা, কিন্তু মেয়েটার দিকে তখনও তাকাবার অবকাশ পাই নি, চেয়ে দেখলুম সত্যিই খানিকটা পেছনে দুটো জোয়ান লোক আসছে।

'ওরা গুণ্ডা বলে বিশেষ ক'রে চেনার উপায় নেই, এমনি ট্রাউজার পরা, তবে লোক দুটোর মুখের চেহারা ভাল নয়।

'তবু যে-গুণ্ডারা মেয়েদের হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় তাদের মতোও মনে হল না। বললুম, "কৈ, গুণ্ডা কারা?"

'ততক্ষণে গাড়ির দোর খুলে উঠে পড়েছে ভেতরে, "আপনার পায়ে পড়ি ফ্ল্যাগ ডাউন ক'রে চালিয়ে দিন জোরে, আমি ওদের চিনি, ওরা নিয়ে গিয়ে বড় টর্চার করে মেয়েদের, পয়সা দেয় না। এখানের সবাই ভয় করে ওদের সেই জন্যে কেউ কিছু বলেও না"।

'গাড়ি চালিয়ে দিয়েছি আমি -ও বলার আগেই, গাড়িতে উঠে বসবার সঙ্গে সঙ্গে।

'কেন না ততক্ষণে ভাল ক'রে চেয়ে না দেখেও চিনতে পেরেছি—ছন্দা।

'ওকে এখানে ঐভাবে দেখব কখনও ভাবি নি বলেই ঐ যা গোড়ায় দু'-এক সেকেণ্ড চিনতে দেরি হয়েছিল।'

আর কিছু প্রশ্ন করার বা বলার প্রয়োজন ছিল না।

এসব মর্মান্তিক সত্য খুব অন্ধ বা নির্বোধ লোকের মনেও এক এক সময় আপনিই, হয়ত বা এমনি এক প্রবল আঘাতে প্রতিভাত হয়।

অপরাহ্নে বা সন্ধ্যায় ওর অনুপস্থিতিগুলোর কারণ দিবালোকের মতোই স্বচ্ছ হয়ে গেল অবনীবাবুর কাছে।

ছন্দা এইখানেই আসে।

এইভাবে খদ্দের ধরতে।

কোথাও কোন অসঙ্গতি নেই।

যা শুনেছেন, বইতে পড়েছেন—ঠিক তেমনিই।

হাতে একটি বাঁধানো খাতা, আর শৌখিন ভ্যানিটি ব্যাগ।

প্রসাধনও উৎকট নয় দেহপণ্যাদের মতো, সামান্য হাল্‌কা একটু পাউডার বোলানো মুখে, চোখে সূক্ষ্ম ক'রে কাজল টানা।

বিকেলে হয়তো একটা রঙিন চশমাও ছিল, এখন সেটা ব্যাগে ঢুকেছে।

কিংবা—চোখ দুটোই তো ওর বড় মূলধন—ওর আর চশমা পরলে চলে না।

'ছন্দা, তুমি এই! তুমিও! এই ক'রে বেড়াবে বলেই এত করি তোমার জন্যে!'

ওখান থেকে বেরিয়ে এসে পার্ক স্ট্রীটের একটা হোটেলের সামনে গাড়ি থামিয়ে বিস্মিত তিক্তকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন অবনীবাবু।

কে জানে এটাও অভিনয় কিনা, অথবা সত্যিই আত্মগ্লানি—ছন্দা ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেলল।

একটু আধটু চোখের জল নয়—প্রবল কান্না।

এত দিনে অবনীবাবুর মনে করুণা বা সহানুভূতির বেশী—অন্য কি একটা মনোভাব গড়ে উঠেছে।

সেটাই যে প্রেম, এই ধরনের আবেগকেই যে প্রেম বলে, তা তিনি বুঝতে পারেন নি।

আজও যে তেমন ক'রে বুঝলেন তা নয়।

শুধু একটা অন্ধ আক্রোশ, একটা প্রচণ্ড উন্মত্ত ক্রোধ অনুভব করলেন এই মুহূর্তে, মনে হ'ল নখে ক'রে ক'রে ঐ মেয়েটার অঙ্গ-

প্রত্যঙ্গগুলো টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলেন—একটু একটু ক'রে যন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে হত্যা করেন।

যা মনে এল তাই বলে গালাগাল দিলেন অবনীবাবু।

কঠোর শুধু নয় -কুৎসিত ভাষায় তিরস্কার করলেন।

কে জানে কেন—আজও তিনি বুঝতে পারেন না--মেয়েটা চুপ ক'বে সব সহ্য করল, যেন মাথা পেতে নিল ওঁর তিরস্কার।

শেষে অবনীবাবুই নরম হয়ে এলেন।

শ্রান্তিতে, প্রবল আবেগের প্রতিক্রিয়ায় তাঁরও চোখে যেন জল এসে গেল।

তিনি ভগ্নকণ্ঠে বললেন, 'কেন, কেন একাজ করতে গেলে ছন্দা, কেন একাজ ক'রে বেড়াও?'

এবার ছন্দা উত্তর দিল, কান্না-ভাঙ্গা গলায়, 'আমার আর কি উপায় আছে বলতে পারেন? আর কি করব আমি? সাতটা পেট —সাতটা লোকের কাপড়-জামা—কোথা থেকে কি ক'রে জোটাব? আর কি যোগ্যতা আছে আমার? চাকরি করতে গেলে লোকের বাড়ি বাসন মাজার কাজ করতে হয়। তাতেও আমার আপত্তি ছিল না, যদি তাতেই সংসারটা চলত। এই চেহারাটা ছাড়া যে আর কিছুই নেই। ···এক এক সময়—সত্যি বলছি—আপনি ব্রাহ্মণ, পরম উপকারী··· আপনার পা ছুঁয়ে বলছি···আত্মহত্যা করতেই ইচ্ছে করে···শুধু এই অনাথা নিরুপায় ভাই-বোনগুলোর মুখ চেয়ে পারি না। আমার আর একটুও বাঁচতে ইচ্ছে করে না···বিশ্বাস করুন। ভগবান নিলে আমার কোন দায়িত্ব থাকে না···এই কষ্ট থেকে অব্যাহতি পাই। এ যে কী জীবন তা আপনাকে বোঝাতে পারব না। আপনি দেবতা, আপনি ভাবতেও পারবেন না, মানুষ কত ছোট, কত লোভী হতে পারে! পশুও ওদের চেয়ে ঢের ভাল।'

'আমাকে কেন বল নি তুমি—এসব কথা?

অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে থেকে আড়ষ্ট কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিলেন অবনীবাবু।

এবার কান্নায় ভেজা কণ্ঠ পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

'বললেই বা কী হত? আপনার যা সাধ্য তা করছেন। ট্যাক্সী চালিয়ে কত পান, কত পেতে পারেন, তা বুঝি তো। আপনি কেন, ঐ বস্তির আরও কয়েকজন কিছু কিছু সাহায্য করেন—কিন্তু এই বাজার, তাতে কি চলে?'

তারপর—একটু বুঝি বা ঈষৎ প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সঙ্গেই বলে, 'আপনিও তো ভেবে দেখতে পারতেন এতগুলো লোকের খরচ কত! ...হয়তো বলতে পারেন, এর সঙ্গে আপনাদের দানটা নেওয়া ঠিক হয় নি—একরকম ঠকানোই হয়েছে—তবে সেও একান্ত নিরুপায় হয়েই নিতে হয়েছে। এই যে জীবন-এর আয়েও পুরো সংসার চলে না। সব দিন কিছু পাইও না। কোন কোন দিন সাহসেও কুলোয় না, শেষ মুহূর্তে ফিরে যাই।'

পরিষ্কার স্পষ্ট কথা।

কোন জড়তা নেই, বৃথা আবেগ নেই।

অপরাধ স্খালনের চেষ্টা নেই, তেমনি কোন অনুযোগও নেই কারও বিরুদ্ধে।

অবনীবাবু কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়লেন।

তাঁর এতক্ষণের উষ্মা যেন এক ধরনের অনুতাপে পরিণত হ'ল।

মিছিমিছি ওকে আঘাত দেওয়ার জন্যে, গালিগালাজ করার জন্যে অনুতাপ।

সত্যিই কি করবে ও, কী আর করার ছিল?

ওঁকে বললেই কি উনি ওদের সব খরচ টানতে পারতেন!

ইংরাজীতে একটা কথা আছে—প্রয়োজনের আইন নেই।

অর্থাৎ যার প্রয়োজন খুব বেশী তার পক্ষে আইন বা ন্যায়-নীতি

মানা সম্ভব নয়। ওসবের ভয় আর তখন তাকে অসৎ পথ থেকে নিবারিত করতে পারে না।

ক্ষুধার চেয়ে বেশী প্রয়োজন আর কী আছে?

চুরি ডাকাতি নরহত্যা কত কী-ই তো করছে মানুষ। ইজ্জৎ বিক্রি তার তুলনায় অনেক সহজ।

শাস্ত্রকাররা হয়ত তা মানবেন না। যাঁরা ভরা পেটে সদুপদেশ দিয়ে বেড়ান তাঁরাও গম্ভীর মুখে ঘাড় নাড়বেন - কিন্তু যাদের এইভাবে অনশনের সামনে দাঁড়াতে হয় তারা স্বীকার করবে, রাহাজানি ছিনতাই ডাকাতির চেয়ে এটা অনেক সহজ-সাধ্য।

যুগে যুগে দেশে দেশে মেয়েরা এই প্রয়োজনে একাজ ক'রে আসছে।

আবারও হাত বাড়িয়ে ওর একটা হাত টেনে নিয়ে মৃদু একটু চাপ দিয়ে বললেন, 'আমাকে মাপ কর ছন্দা, আমি সবটা না বুঝে অনেক কটু কথা বলেছি। কিছু মনে ক'রো না।'

এই প্রথম ছন্দা সোজাসুজি ওঁর বুকে এলিয়ে পড়ে আবারও হু-হু ক'রে কেঁদে উঠল।

কে জানে, হয়ত সে কান্না অভিনয় নয়—হয়ত আন্তরিকই। সত্যিই আজও সেটা ঠিক বুঝতে পারেন নি অবনীবাবু।

॥ ছয় ॥

ছন্দাকে ওদের বাড়ির কাছাকাছি নামিয়ে দিয়ে অবনীবাবুও সোজা বাড়ি ফিবে এলেন।

তখন আর উৎসুক দৃষ্টিতে পথের দিকে চেয়ে ভাড়া খুঁজে বেড়াবার অবস্থা নয় তাঁর।

পারবেনও না পরের হুকুম-মতো চালাতে—য়্যাক্‌সিডেণ্ট ঘটিয়ে বসবেন হয়তো।

প্রেম কি, তা এতদিন জানতেন না।

একটা অস্পষ্ট, আব্‌ছা ধারণা মাত্র ছিল।

বই পড়ে, সিনেমা দেখে যেটুকু অভিজ্ঞতা -তারই ওপর গড়ে-ওঠা ধারণা একটা।

সে প্রেম এবার নিজেই জানিয়ে দিল তার স্বরূপ ও অস্তিত্ব।

ভাল রকমেই জানিয়ে দিল।

প্রেমে পড়লে, কাউকে ভালবাসলে যে এমন অবস্থা হয় মানুষের, তা কখনও মনে করেন নি অবনীবাবু।

খুব বেশী বই পড়েন নি বটে—তবে বাছা বাছা বই পড়েছেন ক'খানা, আর তার সবই তো প্রায় প্রেমের গল্প।

ওর কলেজের বন্ধু ছেনু নাকি সম্পর্কে কোন লেখকের ভাগ্নে হ'ত। সে মামার একটা উক্তি প্রায়ই শোনাত। তিনি নাকি বলেন, পৃথিবীতে মোটামুটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মোট উনপঞ্চাশটা প্লট আছে, এর বেশী আর কেউই আজ পর্যন্ত যেতে পারেন নি। আবার তার মধ্যে দুটো নায়ক আর একটা নায়িকাকে নিয়েই নাকি চল্লিশটা প্লট।

বন্ধুবান্ধবদের মুখে, সহকর্মীদের মুখেও ভালমন্দ শ্লীল-অশ্লীল বিস্তর

গল্প শুনেছেন—কিন্তু আজ বুঝলেন এ সম্বন্ধে এতদিন তাঁর কোন জ্ঞানই হয় নি।

বই পড়ে বা গল্প শুনে এ রকম অনুভূতি ধারণা করা যায় না।

এ আলাদা জিনিস।

এ-ই প্রেম।

একেই নিশ্চয় প্রেম বলে।

এতে শুধু বোকা নয়, পাগল হয়ে যায় মানুষ।

অবনীবাবুও হয়েছিলেন নিশ্চয়।

নইলে যে তথ্য জানবার পর অপরিসীম ঘৃণা বোধ হবাব কথা মেয়েটার ওপর—প্রত্যেক পুরুষেরই যা বোধ হয়, ঘৃণা ও বিদ্বেষ—সেটা জানার পরও, প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাবার পরও শুধুই এরকম একটা অপরিসীম মমতা ও বেদনা বোধ করবেন কেন?

ওকে এই দুর্দশা থেকে রক্ষা করার জন্যে, এই পাঁক থেকে টেনে তোলার জন্যে ওঁর প্রাণটা এমন আকুলি-বিকুলি করবে কেন?

কেন সমস্ত পৌরুষ জাগ্রত হ'তে চাইবে বাইরের এই লাঞ্ছনা থেকে, এই নিদারুণ অপমান থেকে দুই ডানা মেলে তাকে ঢেকে রাখতে, বাইরের ঝড়-ঝঞ্ঝা থেকে আড়াল ক'রে রাখতে?

প্রেমেই এই রকম উলটো বুদ্ধি হয় মানুষের।

সোজা খালিচোখে যেটা কালো, সেটাই সাদা দেখায় প্রেমের চশমা পরলে।

পাপকে পুণ্য বলে বোধ হয়।

দয়িতার কোন কাজটাই অন্যায় বলে মনে হয় না। মনে হ'লেও—প্রেমিক নিজের মনেই হাজারো কৈফিয়ৎ সৃষ্টি করে।···

অবনীবাবু রাত্রে বাড়ি ফিরে কিছু খেলেন না।

এত সকাল ক'রে ফেরার জন্যে সহস্র প্রশ্ন চারিদিকে—সুতরাং মাথা ধরেছে বলে শুয়ে পড়াই সুবিধা।

কিন্তু সারা রাত ঘুমোতে পারলেন না। যাকে বলে চোখে-পাতায় দেখা হওয়া, তা হ'ল না।

সমস্ত রাত হু' চোখ খুলে শুয়ে ছটফট করতে লাগলেন।

একটা উন্মত্ত উদ্দাম কামনা, ঐ মেয়েটাকে নিজস্ব ক'রে পাবার, বুকের মধ্যে চেপে ধরার একটা অদম্য ইচ্ছা, ওকে না জেনে বিচার করা ও কটু কথা বলার জন্যে অনুতাপ, সবটা মিলে ওঁকে অস্থির ক'রে রাখল।

সারা রাত এমনি ছটফট করার পর নিজের মনের চেহারাটা দেখতে পেলেন অবনীবাবু।

বাঁচতে গেলে ঐ মেয়েটাকে চাই তাঁর—যে কোন শর্তে, যে কোন মূল্যে।

এ তাঁর সেই প্রয়োজন—যা ন্যায়, নীতি, সমাজ, ধর্ম কিছু মানে না, কোন বিচার করে না।

স্থির করলেন, ওকে তিনি বিয়েই করবেন, সহধর্মিণীর মর্যাদা দিয়ে ওর পাপের এবং তাঁর অবিচারের প্রায়শ্চিত্ত করবেন।

সুযোগ দেবেন মেয়েটাকে নতুন ক'রে বাঁচবার, নতুন ক'রে বিকশিত হবার, সমাজে নিজের স্থান ক'রে নেবার—মানব জন্ম, নারী-জন্ম ধারণের সার্থকতা লাভ করার—সেই দায়িত্ব বহন করার।

সেই সঙ্গে আর একটি জীবন সার্থক করার, ও আরও হয়ত হু'তিনটি জীবন সৃষ্টি করারও।

এই সঙ্কল্প করার সঙ্গে সঙ্গেই যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত এবং সুস্থ বোধ করলেন, শেষ রাত্রেরও পরে—রাত্রি শেষ ক'রে সকালের দিকে ঘুমিয়ে পড়লেন।

যখন মন স্থির করেন অবনীবাবু তখন নিজের কথাই শুধু ভেবেছিলেন।

তিনি অসাধারণ অনুগ্রহ করছেন একটা, সেই কথা।

তিনিই নেমে আসছেন বৈকি, সব জেনেও ঐ মেয়েটাকে এক ভদ্র ব্রাহ্মণ ঘরের বধূর মর্যাদা দেওয়া— তাঁর পক্ষে অনেকখানিই নেমে আসা।

এতে যে অপরপক্ষের সম্মতি নেওয়া দরকার, তারও যে সুবিধা-অসুবিধার প্রশ্ন আছে—এ-কথা একবারও মনে হয় নি তাঁর।

নিজের উদারতার অহঙ্কারেই—হ্যাঁ, এ-কথা তিনিও স্বীকার করতে বাধ্য—প্রেম ছাড়া একটু অহঙ্কারের ভাবও ছিল তাঁর মনে—ভেবেছিলেন অপরপক্ষ এ অনুগ্রহে ধন্য, কৃতার্থ হয়ে যাবে। অভিভূত হয়ে পড়বে। লজ্জায় আনন্দে রাঙা হয়ে উঠবে।

তাই সকালে উঠে কোনমতে এক পেয়ালা চা খেয়েই যখন ছুটেছিলেন ছন্দাদের বাড়ির দিকে, তখন একটা সকৃতজ্ঞ দৃষ্টি ও আনন্দ উদ্‌ভাসিত মুখই আশা ক'রে গিয়েছিলেন।

আর সেই আশা ও কল্পনায় তাঁর নিজের মুখও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু অবনীবাবুর প্রস্তাবটা শুনে ছন্দার মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠল।

আনন্দ তো নয়ই—আসন্ন সুখের প্রত্যাশায় যে সামান্য লালিমাটুকু মুখে খেলে যাবার কথা তারও আভাস দেখা গেল না।

একটু ক্ষুণ্ণই হলেন অবনীবাবু।

তবু জোর ক'রে মুখে হাসি এনে বললেন, 'তুমি খুশী হচ্ছ না?'

ছন্দা এবার মুখ তুলল, শুকনো মুখে বলল, 'কিন্তু তা কেমন ক'রে হবে? এরা—আমার মা-বাবা, সংসার?'

আহত কণ্ঠে অবনীবাবু উত্তর দিলেন, 'সে-কথা না ভেবেই আমি এত বড় কথাটা পাড়তে গেছি মনে করো? সে ভার এখন থেকে আমার। এ বাড়ির বড় জামাই হবার পর সে দায়িত্ব আমারই তো বইবার কথা, নয় কি?'

তবুও ছন্দার মুখে সেই প্রত্যাশিত সুখ ও আশার আলোটি ফোটে না।

সে ব্যাকুল উদ্বিগ্ন মুখে বলে, 'কিন্তু সে যে অনেক টাকার খেলা! সে কি আপনি যোগাতে পারবেন? এই বাজারে সাতটা প্রাণীর ভরণপোষণ, লেখাপড়ার খরচা—তাছাড়া আপনারও তো সংসার খরচ আছে! বিয়ে হ'লে আরও একটা দায় বাড়বে বৈ তো নয়! না না, এর মধ্যে আর নিজেকে জড়িয়ে ফেলবেন না, আমার কপালে যা আছে তা থাক।'

'উঁহু, তা হয় না ছন্দা। এভাবে তোমাকে আর ঐ নরকের মধ্যে ছেড়ে দিতে পারব না। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি—যদি আমি একমুঠো খেতে পাই—তোমার মা-বাবা ভাই-বোনেরাও পাবে। যেমন ক'রেই হোক সে খরচা আমি টানব। তোমাকে সেজন্যে আর ভাবতে হবে না, মাথা ঘামাতে হবে না। আজ থেকে সব চিন্তা সব দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

তার পরেই আর একটা কথা মনে পড়ে গিয়েছিল।

একটু ক্ষীণ অসহায় ভঙ্গীতেই বলেছিলেন, 'তবে যদি আমাকে না পছন্দ হয়, স্বামী হবার উপযুক্ত না ভাব—সে আলাদা কথা।'

এর আর মৌখিক কোন উত্তর দেয় নি ছন্দা।

হেঁট হয়ে ওঁকে প্রণাম করেছিল পায়ে হাত দিয়ে।

তার পর—কয়েকদিন পরে বলেছিল, 'সেই যেদিন লেকের ধারে যাই কিশোরদার সঙ্গে, সেই দিনই আপনাকে পছন্দ হয়েছিল, এত লোকের সঙ্গে পরিচয়, এত পুরুষ দেখেছি—একমাত্র আপনাকেই মনে ধরছিল তার মধ্যে। অবশ্য ভাববেন যে রূপ দেখে—মনে ধরেছিল আপনার ব্যবহারে। যেসব পুরুষমানুষ দেখেছি এতদিন—তার থেকে অনেক বড়, একেবারে আলাদা।···আপনিই আমাকে পছন্দ করেন নি বরং, নইলে—'

নইলে যে কি সেটা বলতে গিয়েও থেমে গিয়েছিল।

আসল লড়াইটা শুরু হ'ল এর পর।

বাড়িতে প্রস্তাবটা পাড়তে গিয়ে।

বিরোধিতা আসবে একটা—তা জানতেন অবনীবাবু, প্রবল বিরোধিতার জন্যেই প্রস্তুত হয়েছিলেন—তবে সেটা যে এই রকম কদর্য চেহারা নেবে-তা ভাবেন নি।

সকলে মিলে যেন পাগলের মতো কাণ্ডকারখানা বাধিয়ে তুলল।

মা-বাবা দাদা-দিদিরা, মামার বাড়ি মেসোর বাড়ি কাকাদের বাড়ি—চারিদিক থেকে আপত্তি, প্রতিবাদ এবং কটু বাক্য। মা তো অন্নজল ত্যাগ করলেন বলতে গেলে—বাবা ঠাকুরের ছবির সামনে বসে অবিরল ধারে চোখের জল ফেলতে লাগলেন।

যদি ওখানে আগেই বাক্‌দত্ত হয়ে না আসতেন তাহ'লে শেষ পর্যন্ত কি হ'ত বলা যায় না।

যেখানে বহু আত্মীয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয় সেখানে অতি-বড় জেদী লোকও হার মানে অনেক সময়।

আগেই এখানে কথাটা তুললে হয়তো অবনীবাবু এ সঙ্কল্প সেখানেই ত্যাগ করতেন।

কিন্তু ওখানে কথা দেওয়া হয়ে গেছে, অনেক বড় প্রতিশ্রুতি, আর সে-কথা ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়।

বিরাট আশার সৌধ গড়ে তুলেছেন তাদের মানসক্ষেত্রে।

সেই সঙ্গে নিজের অহঙ্কারের উত্তুঙ্গ প্রাসাদ-চূড়া।

উদারতার ঝোকে নিজেকে দেবতার আসনে বসিয়েছেন নিজেই।

ছন্দার সমস্ত সংশয় উড়িয়ে দিয়েছেন। অতবড় সংসারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছেন নিজের কাঁধে। এখন আর তা থেকে ফেরা যায় না।

তা হ'লে ওদের কাছে যত না হোক, নিজের কাছেই মুখ দেখাতে পারবেন না।

এত ছোট হয়ে যাবেন যে—তার পর বেঁচে থাকাই বিড়ম্বনা হয়ে উঠবে।

তাই সমস্ত সংঘাত এবং সংঘর্ষ সহ্য ক'রেও নিজের সঙ্কল্পে অটল রইলেন অবনীবাবু।

কারও কোন কথাই শুনলেন না।

কষ্ট হ'ল খুবই, কিন্তু আর কোন উপায়ও খুঁজে পেলেন না।

তার ফলে সমস্ত সংসারটাই ভেঙে গেল।

বাবা-মা এ বাড়ি ওঁকেই ছেড়ে দিয়ে দুর্গাপুরে চলে গেলেন দাদার কাছে।

কাকা-পিসী-মেসো-মামারা চিরদিনের মতো সংস্রব ত্যাগ করলেন।

মা-বাবাকে কাঁদতে কাঁদতে পৈতৃক ভিটা ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হ'ল, তাঁরা ওঁকে ত্যাগ করতে চাইলেন না, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন না—বরং তাঁরাই যেন অবনীবাবুর অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করছেন এইভাবে দেশ ভিটা ত্যাগ ক'রে চলে গেলেন—এটা শেলের মতোই বিঁধল অবনীবাবুকে, কিন্তু তিনিও তখন অসহায়।

অবশ্য তিনি বলেছিলেন, মা-বাবাকে যেতে হবে না, তিনিই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন, তাঁর জন্যে ওঁরা কেন পিতৃপুরুষের ভিটে ছাড়বেন?

তার উত্তরে যার মুখ দিয়ে কথাটা বলিয়ে ছিলেন অবনীবাবু, তার কাছে হাতজোড় ক'রে ওর বাবা বলেছিলেন, 'অনেক করেছে, মা-বাপের ঋণ ভালভাবেই শোধ করেছে- আর কেন? শ্বশুরবাড়ি ঘর-জামাই হয়ে বাস ক'রে চূড়ান্ত অপমানটুকু আর না-ই করল। পিতৃপুরুষের হয়ে এইটুকু মাত্র দাবী করছি—সে কলঙ্ক থেকে অব্যাহতি দিক অন্তত তাঁদের।'

শুধু বে-জাতে বিয়ে করাতেও তাঁদের অত আপত্তি ছিল না—ছন্দারা জাতে কর্মকার -কী ভাবে যেন ভাবী পুত্রবধূর গোপন লজ্জার ইতিহাসটাও তাঁদের কানে পৌঁছে গিয়েছিল।

কারা কারা নাকি তাকে লিণ্ডসে স্ট্রীট, ফ্রী স্কুল স্ট্রীট অঞ্চলে ঘুরতে দেখেছে, অবনীবাবুরই এক পিসতুতো ভাই নাকি দু' তিনটি অফিস-বন্ধুর সঙ্গে জীপে তুলে নিয়ে গিয়ে ডায়মণ্ড হারবার ডাকবাংলোয় রাত কাটিয়ে এসেছে —এমনি বহু কথাই তাঁদের কানে এসে পৌঁছল।

এর পর সে মেয়েকে পুত্রবধূ বলে গ্রহণ করা তাঁদের পক্ষে আর সম্ভব নয়।

সেটা সমগ্র পিতৃপুরুষের অপমান, অন্তত তাঁদের কাছে।

চরম অকৃতজ্ঞতা।

এ অনাচার সহ্য করাই নাকি পাপ, ওঁর বাবা বলেছিলেন, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত তুষানলে প্রাণত্যাগ করা। নিতান্ত তাঁরা ভীরু, কাপুরুষ বলেই তা পারলেন না —এইভাবে মেনে নিলেন।···

সবাইকে ত্যাগ ক'রে নির্জন শূন্য বাড়িতে নববধূকে এনে তুললেন অবনীবাবু।

তাঁর প্রতিশ্রুতি তিনি পালন করবেনই। ব্রাহ্মণের ছেলে, ভদ্রলোকের ছেলে থুথু রাস্তায় ফেলে আর সে থুথু নিজে চাটতে পারবেন না, দেওয়া কথা ফিরিয়ে নিতে পারবেন না।

সব রকম প্রতিশ্রুতিই তিনি পালন করবেন অক্ষরে অক্ষরে।

আসলে সেদিন একটা অন্তঃসারশূন্য মিথ্যা কর্তব্যবোধের অহমিকায় এই নিদারুণ লজ্জা ও অনুতাপ ঢাকার চেষ্টা করেছিলেন অবনীবাবু।

আত্মপ্রসাদের মদ খাইয়ে নিজের বিবেকবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিলেন।

॥ সাত ॥

কিন্তু আবেগের মাথায় যখন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তখন তার দায়িত্বের পূর্ণ পরিমাণটা বুঝতে পারেন নি।

প্রথম প্রেমের বন্যা যখন মনের দুই কূল ছাপিয়ে ওঠে, তখন সে জলস্রোতে হিসেবটাই আগে ভেসে চলে যায় কোথায়!

তবে একটা হিসেবে ভুল করেন নি।

ছন্দার ইচ্ছা ছিল মা-বাবা ভাই-বোন সকলকে এই বাড়িতে এনে তোলে, সেই প্রস্তাবটাতে অবনীবাবু রাজী হন নি।

বাবার শেষ কথাটা ভেবেই বোধ হয় রাজী হন নি।

এও তো একরকম ঘর-জামাইয়ের অবস্থাই হ'ল।

তা ছাড়া বাবা যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন তাঁর বাড়ি, যে-কোন সময় এসে সে বাড়ি দাবী করতে পারেন—সেখানে অতবড় গুষ্টি এনে ঢোকাবেন কোথায়?

একবার এনে ফেললে 'যাও' বলা চলবে না।

তখন শুধু খাওয়ানোর দায়িত্বই নয়—আশ্রয়ের দায়িত্বও চাপবে মাথায়।

বাবা গেলেও মা আছেন, দাদা আছেন—বাড়িতে তাঁদেরও অংশ থাকবে।

তখন সে অনধিকার প্রবেশ নিয়ে তাঁরা যথেষ্ট অপমান করলেও মুখ বুজে মাথা হেঁট ক'রে সহ্য করতে হবে।

এই নিয়ে অপ্রীতি—মামলা-মোকদ্দমা হওয়াও বিচিত্র নয়।

আর তখন তাঁর দিক থেকে কোন যুক্তি প্রয়োগ কি কিছু বলারও থাকবে না।

তাছাড়া—হয়ত অত ঘনিষ্ঠতা করতে ঠিক মন চায় নি।

'পরভাতী' বরং ভাল, 'পরঘরী' ভাল নয়—বাবা প্রায়ই বলেন।

সম্পূর্ণ ভিন্ন শিক্ষা-দীক্ষা আচার-ব্যবহার ওদের; ছন্দার ভাই-বোন-বাবার প্রবল বাঙালে টান—অত কাছাকাছি নিত্য-নিয়ত সহ্য হবে না।

তার চেয়ে খরচ দেওয়া ঢের সোজা।...

কে জানে এঁইটেই হিসেবে ভুল হল কিনা।'

আর একটা বাসা—তুই বাড়ির মধ্যে ভাগ করা জীবন যাপনের প্রস্তাবে রাজী হওয়াটাই হয়ত অন্যায় হয়েছিল।

বৃহত্তর অন্যায়ের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল!

তখন অত ভাবেন নি।

ভদ্রলোকের স্ত্রী, ভদ্রঘরের বধূরূপে প্রতিষ্ঠিত হবার পর—নিশ্চিন্ত নিরাপদ জীবন যাপনের আস্বাদ পাবার পর, নিজস্ব গৃহস্থালীর নেশা লাগলে—আর উড়ু উড়ু করতে চাইবে না; এইটেই আশা করেছিলেন।

ছেলেপুলে হয়ে গেলে তো কথাই নেই।

কিন্তু সে ছেলেপুলে ওঁদের হয় নি।

কিশোর বলেছে—পরে বলেছে অবনীবাবুকে—হবার উপায়ও নাকি ছিল না।

ছন্দা নিজেই রাখে নি।

যে বিপজ্জনক জীবন তাকে যাপন করতে হয়েছিল, তাতে নাকি এ অবস্থাটা আত্মরক্ষার একটা প্রধান অস্ত্র।

খবরটা শুনে ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন অবনীবাবু ঠিকই—কিন্তু তখন খুব একটা ক্ষুব্ধ হন নি।

তখনও প্রথম প্রেমের আবেগ যথেষ্ট ছিল—তাই ছন্দার হয়েই যুক্তি দিয়েছিলেন, এটা অনেকখানি আত্মত্যাগ—মেয়েদের পক্ষে চরম স্বার্থত্যাগের কথা।

মা-বাবা ভাই-বোনের জন্যে যে এতটা পারে, সে তো নমস্যা। নিন্দনীয়া নয়—আর যাই হোক। সেই আত্মত্যাগের সঙ্গে পাল্লা দিতে নিজেও আত্মত্যাগের প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন।

নির্বোধের মতো দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালনে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছিলেন।

ছ'টা প্রাণীর ভরণ-পোষণের ব্যয় যে কী ভয়ানক হতে পারে—তা ধারণায় ছিল না ওঁর।

বাজারের—সংসার খরচের বিভিন্ন ব্যয়ের কথাটা যে না জানতেন তা নয়।

মহত্ত্বের আবেগে প্রতিশ্রুতি দেবার সময় সে হিসেবটা তলিয়ে বোঝার চেষ্টা করেন নি।

কথা দেবার সময় রেশন আর বাজারের কথাই ভেবেছিলেন; ঘুঁটে কয়লা কেরোসিন তেল, আলো, মেথর, বাজার, রেশন, তেল-মশলা, কাপড়-জামা-জুতো, ইস্কুলের মাইনে (ছোট দুটোর তখনও নাম ছিল ইস্কুলে), বইখাতা, চা-চিনি-দুধ-জলখাবার, কালি-কলম-পেন্সিল, সাবান-ধোপা-নাপিত—এত বিচিত্র এবং বিবিধ খরচের কথা ভাবেন নি।

তাঁদের দু'টি লোকের সংসারেও এ খরচা কম নয়। শুনতেই ছোট সংসার—দুটি প্রাণী। শুধু বই-খাতা এবং ইস্কুলের মাইনে ছাড়া ঐ সব ক'টাই তাঁদেরও আছে।

আর সে অঙ্কও নিতান্ত সামান্য নয়।

এত টাকা সত্যিই একখানা ট্যাক্সী চালিয়ে রোজগার হয় না।

ভোর থেকে রাত বারোটা-একটা পর্যন্ত, সপ্তাহে সাতদিন খেটেও না।

আর একখানা গাড়ি থাকলে হয়ত সামলানো চলত। সে সম্ভাবনা নিজেই নষ্ট করেছেন ইতিপূর্বে ওদের সাহায্য দিতে গিয়ে।

সামান্য যেটুকু হাতে ছিল সে জমা টাকাও সব নিঃশেষ হয়ে গেল।

না হ'ল আর একখানা গাড়ি কেনা, না হ'ল বাবার দেনা শোধ।

হাতের সঞ্চয় শেষ হ'তে ঋণ শুরু হ'ল।

তবু অবনীবাবু 'না' বলতে পারলেন না! পারলেন না আত্ম-ত্যাগের প্রতিযোগিতায় পিছু হঠতে। নিজে যেচে সাউখুড়ি করে যাদের অন্নবস্ত্রের ভার নিয়েছেন, তাদের মাত্র একান্ত-প্রয়োজনীয় খরচে আপত্তি বা অসামর্থ্য জানানো যায় না।

বিশেষ ওরা কোন বিলাস করে না এটা ঠিক। প্রাণপণে কষ্ট করে তা অবনীবাবু চোখেই দেখেন।

নিতান্ত যেটুকু না হ'লে নয় সেইটুকুর জন্যেই তাঁর কাছে হাত পাতে।

এটা দিতে তিনি বাধ্য।

আর এমনই অদৃষ্ট, ওদের অন্য কোন ব্যবস্থাও ক'রে দিতে পারলেন না অবনীবাবু।

ছন্দার পরে যে ভাই অজিত, সে এখনও সেই রেশনের দোকানেই কাজ করে, কিন্তু আগে তবু সে মাসে দশ-পনেরো টাকা দিত, এখন তাও পাঠায় না।

দিদির বড়লোকের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, সে-ই সংসার চালাচ্ছে—মিছিমিছি আর এই ক'টা টাকা ঘুষ দিয়ে লাভ কি, থাকলে নিজের কাজে লাগবে—বোধ হয় এই মনোভাব।

ছন্দা বলে, তা নয়, নিশ্চয় নেশাভাঙ করতে শিখেছে, কিংবা ওখানে কোন অসৎসঙ্গে পড়েছে।

তেমনি আভাস নাকি তার কথাবার্তায় আচার-আচরণে টের পাচ্ছে ছন্দা ইদানীং। কে জানে কোন গুণ্ডার দলেই মিশল কিনা!

তার পরে বোন একটি—নন্দা, মেয়েটা দেখতেও যেমন খারাপ, তেমনি অসম্ভব বোকা। লেখাপড়া কিছুই শিখতে পারে নি, সংসারের কাজও গুছিয়ে করতে পারে না, দিনরাত বকুনি খায়। তার পরে যারা, তাদের কারুরই উপার্জনের বয়স বা সামর্থ্য হয় নি।

নন্দার একটা বিয়ে দেবারও চেষ্টা করেছিলেন অবনীবাবু, যদি বা এ সংসারের দায়িত্ব সে জামাই ভাগ ক'রে নাও নিতে পারে—একটা লোকের খরচ তো কমবে ! কিন্তু ঐ মেয়েকে বিনা পয়সায় নিতে কেউই রাজী হয় নি।

বিশেষ ওর দিদির দুর্নাম একটা তখনও থেকে গিয়েছিল—বিবাহিত জীবনের পরও তার অতীত জীবনের অন্ধকার ছায়াটা এসে দাঁড়াত এইসব কথাবার্তার মধ্যে।

কোথা থেকে কী ক'রে যে এসব খবর পৌঁছত— কেমন ক'রে যে এসব দুর্নাম পৌঁছয় ! ভাবতে অবাক লাগে অবনীবাবুর।

আজও এ রহস্যটা তিনি বুঝতে পারেন না।

'ধর্মের কল বাতাসে নড়ে'—এ প্রবাদের যথার্থতার আর কোন প্রমাণ পেয়েছেন বলে মনে পড়ে না—কেবল এই একটি ক্ষেত্রে দেখেছেন কথাটা কত সত্য।

শেষে একদিন 'না' বলতেই হ'ল।

হাত গুটোতে হ'ল অবনীবাবুকে। নিতান্ত নাচার হয়েই।

কোথাও আর কিছু রইল না যখন, যখন পাওয়ারও সব পথ বন্ধ হয়ে গেল, তখন বাধ্য হয়েই বলতে হল, 'এতটা আমি আর টানতে পারছি না। সম্ভব নয়।'

সত্যিই আর সম্ভব ছিল না।

কোন মতেই।

সব চেষ্টাই দেখেছেন তিনি।

এটা তাঁর কাছে সম্মানের প্রশ্ন ছিল সেদিন—প্রাণের চেয়েও বড়।

তাই কোন প্রয়াসেই ত্রুটি রাখেন নি।

কিন্তু মানুষের প্রয়াসের সীমা আছে—এটাই মাঝে মাঝে ভুলে যায় মানুষ।

ততদিনে গাড়িও বিক্রী হয়ে গেছে অনেকদিন—জমে-ওঠা বিপুল দেনা শোধ করতে।

এতটা দেনা যে জমেছে তা আগে অত বুঝতে পারেন নি।

পাওনাদাররা যখন রুদ্রমূর্তি ধারণ করল তখন কতকটা দিশেহারা হয়েই একমাত্র যা উপার্জনের পথ তাই বন্ধ করতে হ'ল ওঁকে।

যে রাজহাঁস সোনার ডিম দেয়-তাকেই বধ করলেন তিনি, ঈশপ-কাহিনীর সেই লুব্ধ নির্বোধের মতো।

আত্মহত্যাই ক'রে বসলেন বলতে গেলে।

যে ডালে বসেছিলেন-কালিদাসের মতো সেই ডালের মূলেই কোপ মারলেন।

অর্থাৎ আয় আরও সীমিত হয়ে উঠল। এখন পরের গাড়ি—নিজের গাড়িই পরকে দত্তক দেওয়া—শতকরা পনেরো টাকা কমিশন আর দু'টাকা খোরাকী, এই ব্যবস্থা।

এর অর্থ বোঝা কঠিন নয়।

মুখ শুকিয়ে উঠল ছন্দার।

'কী হবে ওদের ?' অসহায় ব্যাকুলভাবে এই প্রশ্নই করতে লাগল সে বার বার।

অবনীবাবু নিজেদের খরচ একেবারে কমিয়ে দিলেন, খোরাকির দুটো টাকা বাঁচাবার জন্যে নুন দিয়ে মাখা আটার বাসি রুটি নিয়ে বেরোতে লাগলেন। যা উদ্বৃত্ত থাকে তার সবটাই ধরে দেন ওদের।

কিন্তু সেটা যে পর্যাপ্ত নয় তা তিনিও মানতে বাধ্য।

কিছুই হয় না সে টাকায়।

ছ' সাতজন লোকের একটি পরিবারের শুধু নুনভাতও যোগানো যায় না।

অন্য খরচের কথা ভাবাও বাতুলতা।

অথচ উপায়ও তো আর কিছু নেই।

সেই কথাটাই বার বার বোঝাতে লাগলেন ছন্দাকে।

এক এই বাড়িটা আছে।

কিন্তু এখনও বাবা বেঁচে, বাড়ি তাঁর —বিক্রী করতে বা বাঁধা দিতে গেলে তাঁর সই লাগবে। তিনি করবেন কেন?

অবনীবাবু বললেন, 'দেখ, তুমি তোমার বাবার অনেকগুলি সন্তানের একটি। বড় বটে তবে বড় হ'লেও মেয়ে। তোমারই কী সব দায়িত্ব? শুনতে খারাপ লাগবে—কিন্তু কথাটা তো সত্যি—তোমার বাবা যে সামান্য অবস্থায় এতগুলি ছেলেমেয়ের জন্ম দিয়েছিলেন সে কি তোমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে? বড় ছেলে বড় হয়ে গেছে—সে যেমন ক'রে পারে খাওয়াবে। আমিও তো টাকা দিচ্ছি কিছু কিছু—না চালাতে পারে একবেলা খাবে। আর উপায় কী; আমার যথাসর্বস্ব তো ওদের জন্যে দিয়েছি, আরো কী করতে বলো তুমি? আমরা ভাল খেয়ে সুখেভোগে থেকে ওদের বঞ্চিত করছি তা তো নয়। আমরাও শুধু নুন-ভাত খাচ্ছি, তারাও তাই খাক।'

হয়তো একটু তিক্তও হয়ে ওঠে অবনীবাবুর কণ্ঠ।

সেটা স্বাভাবিক।

ছন্দা কোন প্রতিবাদ করে না।

ম্লানমুখে নীরবে বসে নিজের পায়ের নখ খোঁটে শুধু।...

এর মধ্যে ছন্দার বাবা অসুখে পড়লেন।

পেট ছেড়েছে, জ্বর। প্রেসার খুব নেমে গেছে। নাড়ির চাল মিনিটে চল্লিশের বেশি ওঠে না।

অবস্থা খারাপ তাতে সন্দেহ নেই।

উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠারই কথা।

নিজের লোক হ'লে—বা অন্য ক্ষেত্র হ'লে—অবনীবাবুও উদ্বিগ্ন হতেন। ডাক্তার ডাকতেন।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে ভদ্রলোকের বাঁচারই কি প্রয়োজন, কী সার্থকতা সেইটেই ভেবে পান না অবনীবাবু।

আর কি ভোগের জন্যে, আর কী সুখে বেঁচে থাকতে চান উনি—যে, চিকিৎসা করিয়ে ভাল করতে হবে।

এত দুঃখের পয়সা খরচ ক'রে?

মরাই তো ভাল এই বেলা—তাতে নিজেও ছুটি পান, ছেলেমেয়েদেরও বোঝা কমে কতকটা।

কিন্তু এসব কথা ছন্দাকে বোঝানো যায় না।

মুখে উচ্চারণ করতেও সাহস হয় না।

চিকিৎসারই ব্যবস্থা করতে হয় বরং····

ডাক্তার ডাকা যায় নি একবারের বেশি।

অবনীবাবু পরামর্শ দিয়েছিলেন, পাড়ায় এক ভদ্রলোক বিনা-পয়সায় রোগী দেখেন -তাঁকে ডাকতে।

হোমিওপ্যাথী ওষুধ দেন--নামও যে একেবার নেই তা নয়।

তাই ডাকতে হ'ল--কিন্তু সে ব্যবস্থায় যে ছন্দা খুশী নয় আদৌ, তাও অবনীবাবু লক্ষ্য করলেন।

এটা নিতান্ত অবুঝের মতো অভিমান। ছন্দা কি তাঁর অবস্থা দেখছে না?

অবনীবাবুও একটু ক্ষুণ্ণ হন স্ত্রীর এই অবিচারে।

অনেকদিন ধরেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা পাঁচিল গড়ে উঠছিল ধীরে ধীরে—অভাবের শুরু থেকেই—এবার বোধহয় দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে উঠল।

স্ত্রীর এই অবুঝপনায় অবনীবাবু অত্যন্ত আহত বোধ করেন, এটাকে 'আঘাতের সঙ্গে অপমান যোগ করা' বলে মনে হয় তাঁর।

অবনীবাবু গাড়ি নিয়ে বেরোন সাতটায়, তারও আগে—ছ'টায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হয় তাঁকে।

এখন পরের গাড়ি, তার কাছ থেকে হিসেবপত্র বুঝে ও বুঝিয়ে, তেলের টাকা নিয়ে বেরোতে হয়।

গাড়ি পুরনো হয়ে এসেছে, সেজন্যে খুটখাট মেরামতি কাজ থাকেই, কারখানায় পাঠাতে হয় মাস দু'মাস অন্তরই প্রায় (আয় কমে যাওয়ার এও এক কারণ, কারখানায় গেলে কয়েকদিনই বসে থাকতে হয়)—তবুও ছোটখাট অসুবিধা প্রায় নিত্যই লেগে থাকে।

সে জন্যেও আগে বেরোতে হয়।

ছ'টায় বেরোন, রাত দশটা-এগারোটায় ফেরেন।

তার আগে দুপুরে খেতে আসতেন, এখন আর সে বালাইও নেই।

ছন্দা একেবারে রাত্রেই উনুনে আঁচ দেয়, বাড়ি ফিরে গরম ভাত খান অবনীবাবু।

ভোরে রুটি নিয়ে যান, সে রুটিও তখনই ক'রে রাখা হয়। নুন ও কাঁচালঙ্কা দিয়ে আটা মেখে রুটি করে ছন্দা, যাতে কোন তরকারীর প্রয়োজন না হয়।

গলা শুকিয়ে যেতে পারে বলে তার সঙ্গে একটা ক'রে পিঁয়াজ নিয়ে যান অবনীবাবু।

পাঞ্জাবীদের মতো পিঁয়াজ টাক্‌না দিয়ে মোটা ঝাল-রুটি খান।

এতে স্বাস্থ্য ভেঙে যাচ্ছে জেনেও আর কোন পুষ্টিকর খাদ্য কি ভাল সব্‌জীরও ব্যবস্থা করতে পারেন নি।

স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করার উপায় ছিল না।

দায়িত্ব নিয়েছেন শখ ক'রে -ইচ্ছে ক'রে বোঝা ঘাড়ে তুলেছেন—সেইটেই বহন করতে পারছেন না পুরোপুরি।

নিজের জন্যে বাড়তি খরচ করার অধিকারই নেই তাঁর।

ছন্দাও এই খায়।

খাওয়াটা ঘুরিয়ে নিয়েছে ওরা। রাত্রে ভাত দিনে রুটি।

সুতরাং দিনে অখণ্ড অবসর।

বাড়ির আর কাজ কি ? দু'খানা ঘর ঝাড়া-মোছা দশ মিনিটেই হয়ে যায়।

সেইজন্যেই অবনীবাবুর অনুমতি নিয়ে দুপুরে বাপের বাড়ি যায় ছন্দা।

বাপকে নাকি ভাই-বোনেরা কেউ দেখে না ভাল ক'রে।

এসব ওরা বোঝেও না।

ছন্দা গেলে তবুও অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।

মায়েরও একটু সেবা করা যায়।

ছন্দা গেলে, সে বললে, তিনি কাজকর্ম করেন তবু।

অপত্তি করেন নি অবনীবাবু।

ওঁর কিছু মনেও হয় নি।

এতকালের মধ্যে স্ত্রীকে অবিশ্বাস করার মতো কোন কারণও দেখা দেয় নি।

ছন্দা যে তাঁকে ভালবাসে তাতে কোন সন্দেহ ছিল না।

আর যে ভালবাসে তাকে অবিশ্বাস করার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না।

এক আপত্তি হ'তে পারত খরচের জন্যে, কিন্তু খুব একটা দূরে নয় বলে যাওয়ার সময় ছন্দা হেঁটেই যায়—ফেরার সময় খানিকটা পথ বাসে আসে—মোট ছ'পয়সা খরচ।

এটুকুর জন্যে কিছু বলা উচিত নয়।

যার কোন শখ-শৌখিনতা নেই, কাপড়-কাচা সাবান মেখে যে গা ধোয়—তার মানসিক শান্তির জন্য এটুকু খরচ করতে কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়।

এইভাবেই চলছিল।

হঠাৎ একদিন সব গোলমাল হয়ে গেল।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হ'ল বলতে গেলে। বিকেলের দিকে এক-দল যাত্রী উঠল শিয়ালদা থেকে, তারা ঐ বস্তিতেই যাবে।

কথায় কথায় পরিচয় বেরিয়ে গেল।

ছন্দাদের তারা চেনে। ছন্দা যে নিত্য বাপের সেবা করতে যায় তাও জানে তারা।

বড়ই কষ্ট হয় বেচারীর, দুপুরে গিয়ে আবার এক ঘণ্টার মধ্যেই বেরিয়ে পড়তে হয়।

ঠেকো দুপুর রোদে এতটা পথ আসা-যাওয়া!

বাড়ি খালি পড়ে থাকে বলেই বেশীক্ষণ থাকতে সাহস করে না ছন্দা।

যা দিনকাল!

স্টিয়ারিং কেঁপে যায়, গাড়ি মাতালের মতো এদিক-ওদিক করে।

ক্ষণকালের জন্য যেন হাতে জোর থাকে না অবনীবাবুর।

বুকের মধ্যেটায় যেন কে বরফ চেপে ধরেছে বলে মনে হয়।

একেই কি করোনারী থম্বসিস বলে?—তাব মধ্যেই মনে হয় একবার।

না, না। তাতে তো খুব যন্ত্রণা হয় নাকি!

এই তো সম্প্রতিই ওঁর বাবা মারা গেছেন ঐ রোগে।

সে সময় নাকি তীব্র যন্ত্রণা বোধ কবেছিলেন বুকে।

(কে জানে—তাব জন্যও অবনীবাবুই দায়ী কিনা!)

দুর্ঘটনা হ'তে হ'তে কোন মতে বেঁচে যায় গাড়ি।

রাস্তার লোক হা হাঁ ক'রে ওঠে।

ট্রাফিক কনস্টেবল্ ভ্রূকুটি ক'বে নম্বরও নেয় বোধ হয়।

মনকে চাবুক মেরে নিজেকে সামলে নেন অবনীবাবু।

সহজ প্রকৃতিস্থভাবেই গাড়ি চালান আবার।

এতদিনের অভ্যাসে যন্ত্রবৎ কাজ করে স্নায়ু।

দুর্ঘটনার সম্ভাবনাতে একবার গাড়ির এরা চেঁচিয়ে উঠেছিল—তাছাড়া অত কেউ লক্ষ্য করে নি।

নিজেদের মধ্যেই গল্প করছিল।...

ওদের পৌঁছে দিয়ে ফিরছেন—ছোট শালীর সঙ্গে দেখা।

কী একটা জিনিস আনতে দোকানে গিয়েছিল বোধহয়।

হাতে ছোট একটা কাগজের মোড়ক।

মেয়েটার বয়স নিতান্ত কম না হ'লেও একটু বোকা বোকা ধরন, ছেলেমানুষের মতোই কথাবার্তা।

'কী, কোথায় গিছলে?' জিজ্ঞাসা করেন অবনীবাবু, 'দিদি চলে গেছে তো?'

খুবই সহজ হবার চেষ্টা করেন, সহজভাবেই বলার—কিন্তু কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক হয় না।

মেয়েটা তেমন চালু নয় বলেই ধরতে পারে না তফাৎটা।

'হ্যাঁ। সে তো অনেকক্ষণ। কিশোরদা এসেছিল, তার ট্যাক্সিতেই চলে গেছে। তখন প্রায় পাঁচটা হবে। কিশোরদা তো আমাদের গলিতে ঢোকে না, ঐ মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আমি সঙ্গে এসেছিলুম আজ—কিশোরদার কাছ থেকে একটা টাকা চেয়ে দিয়ে গেল দিদি। তাতেই তো দোকানে গিছলুম। তখনই কিশোরদা বললে শুনলুম কিনা, চল চল দেরি হয়ে গেছে খুব। পাঁচটা বাজে। তাড়াতাড়ি উঠে পড়।'

আরও কত কি বলে গেল মেয়েটা—সব কথা কানে গেল না।

কানে গেলেও মাথাতে যাবে না আর।

যাওয়া সম্ভব নয়।

মিটারে লাল কাপড় জড়িয়ে অনেক ঘুরলেন অবনীবাবু।

নিউ মার্কেটের পাড়া, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, লেক—শেষে কি ভেবে সাড়ে আটটা নাগাত একটা ছবিঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

নতুন একটা কি ছবি এসেছে—খুব ভীড় হচ্ছে এখানটায়।

সবাই দু'বার তিনবার করে দেখেছে।···

নিতান্তই আন্দাজে ঢিল ছোঁড়া।

এত তাড়াতাড়ি দেখা পাবেন ভাবেন নি। তিন-চার দিন এমনি ঘুরতে ঘুরতে যদি দেখা পেয়ে যান—এই কথাই ভেবে রেখেছিলেন। স্ট্যাণ্ডে গাড়ি রেখে তাই অন্যমনস্কভাবে এসে দাঁড়িয়েছিলেন ফয়্যারের নিচে।

কিন্তু এমনই দৈবের যোগাযোগ—প্রথম যে ক'জন লোক বেরিয়ে এল শো ভাঙতেই—তাদের মধ্যেই ছন্দাকে দেখতে পেলেন উনি।

একটি মোটা, অবাঙ্গালী, অত্যন্ত চকচকে পোশাক পরা লোক তার কোমর জড়িয়ে ধরে নিয়ে আসছে। ছন্দাও সুনিপুণ আধুনিকতার সঙ্গে মাপা হাসিতে এলিয়ে পড়ছে।

সিঁথির সিঁদুর সাময়িকভাবে মুছে চুল দিয়ে তার চিহ্নও ঢেকে দেওয়া হয়েছে।

পরনের শাড়িটাও অপরিচিত, হয়তো এটা লুকোনো থাকে।

বাড়িতে পৌঁছে আবার তুলে রাখে।

চোখে চোখ মিলল বৈকি।

একেবারেই প্রস্তুত ছিল না—তাই আত্মগোপনের কোন চেষ্টাও করে নি।

মুহূর্তে পাথর হয়ে গেল ছন্দা।

তবে সে মুহূর্তকালের জন্যই। তার পরই আবার সহজভাবে, তেমনি মিষ্টি সুরে হাসির মধ্যেই কথা কইতে কইতে বেরিয়ে গেল সেই লোকটির সঙ্গে।

নতুন ধনী—কোন একটা মওকায় টাকা পেয়ে যারা সম্ভোগের বাজারে নতুন নেমেছে—তাদেরই একজন।

সেই হঠাৎ-পাওয়া পয়সার চিহ্ন সর্বত্র—পোশাকে-আশাকে আচরণে।

লাল টেরিলিনের জামার সঙ্গে সবুজ প্যাণ্ট পরেছে, চুলে পমেড লাগিয়ে অতিরিক্ত চকচকে ক'রে তুলেছে মাথার স্বল্পাবশিষ্ট চুল।

অবনীবাবুও আর দাঁড়ান নি।

বুকেব বোঝা হাল্‌কা হয়ে গেলে যেমন সুস্থ বোধ করে লোকে—স্ত্রী সম্বন্ধে নিশ্চিত ও নিঃসংশয় হ'য়ে তিনিও তেমনি সহজ এবং সুস্থ বোধ কবলেন।

পথে প্যাসেঞ্জাবও তুললেন কয়েকজন।

অনেক লোকসান হয়ে গেছে সন্ধ্যাব সময়—ভাড়া খাটবাব আসল সময়টায়, মালিক বকাবকি কববে কম টাকা দেখলে।

উনিই গাড়িব নতুন মালিক। ছন্দাব ও তাব বাপেব বাড়িব দৌলতে।

সেই শেষ দেখা।

তাব পব এই। অচৈতন্য অবস্থায়।

ছন্দা আব বাড়ি ফেবে নি।

অবনীবাবুও আশা কবেন নি তা। দিন-দুই পবে একটা চেনা রিক্সাওলা ডেকে তাব কাপড়-জামা ও সামান্য যা জিনিস ছিল পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

কলহ-বিবাদ করেন নি, চিঠি লেখেন নি, কোন কৈফিয়ৎ তলব কবেন নি।

নিশ্চিহ্ন ক'বে মুছে ফেলতেই চেয়েছিলেন ঐ পর্বটা জীবন থেকে।

জবাবদিহি করতে হয়েছিল পরিচিত লোকদেব, বন্ধুবান্ধবদের কাছে। সবল সত্য কথাই বলেছিলেন তাদের—খবচ যোগাতে পারি নি বাপের বাড়ি চলে গেছে তাই।

ছন্দাও কোন খবব নেয নি, চিঠি লেখে নি।

ক্ষমা প্রার্থনা করার কি ফিবে আসারও চেষ্টা কবে নি। কোন নাটক যে করে নি—সেজন্য অবনীবাবু কৃতজ্ঞতাই বোধ করেছেন।

ওর মা মারা গেছে এটা শুনেছেন অন্য লোকের মুখে। আরও কিছুদিন পরে শুনেছেন ছন্দা কোথায় চলে গেছে, আলাদা কোথাও থাকে হয়ত—মাঝে মাঝে মনিঅর্ডার ক'রে টাকা পাঠায়।

তারপর কোন খবর পান নি।

মাঝে ঐ একবার ছাড়া। ঐ যে সেই সত্তরটাকা আদায় ক'রে দিয়েছিলেন যেদিন বদমাইশ লোকটার কাছ থেকে।

অবশ্য খবর রাখার কোন চেষ্টাও করেন নি।

ভুলতেই চেয়েছিলেন, ভুলেও গিয়েছিলেন অনেকটা।

হয়ত আরও কিছুদিন গেলে ক্ষতটা শুকিয়েই যেত একেবারে।

এমনিতেই অনেক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলেন।

অর্থাভাব দূর হয়েছিল, সেইটেই বড় কথা।

দুবেলা খাওয়া জুটছে, সিগারেট খেতে পারছেন—এই যেন অনেক আরাম এখন ওঁর কাছে। ছন্দা চলে গিয়ে তাঁকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেছে—এজন্য তিনি নিজেকে তার কাছে ঋণী ভাবতেই শুরু করেছিলেন ইদানীং—

কিন্তু এইভাবে যে সে আবার তাঁর জীবনে এসে পড়বে—তা কে জানত!

দীর্ঘ কাহিনী শেষ ক'রে দোকানের ঘড়িটা দেখে ব্যস্ত হয়েই উঠে পড়লেন অবনীবাবু, 'ইস্, সাড়ে ছ'টা বেজে গেছে! যাই ভাই—কিছু মনে করবেন না। ওরা আবার বন্ধ ক'রে দেবে—ডাক্তারদের সঙ্গে একটু—।'

চা-খাবারের দাম আগেই চুকিয়ে দিয়েছিলুম।

এখন ওঁর সঙ্গে বেরিয়ে জোরে হাঁটতে হাঁটতে প্রশ্ন করলুম, 'তা ভাল হয়ে উঠলে কি করবেন? বাড়ি নিয়ে যাবেন?'

'ভাল হয়ে উঠুক তো আগে। এখনও ওসব কথা ভেবে দেখার সময় পাই নি।' যেতে যেতেই উত্তর দিলেন, আমার দিকে না ফিরেই।

তিনি প্রায় ছুটতে শুরু করেছেন ততক্ষণে।

তাঁর সঙ্গে তাল রেখে চলা সম্ভব হ'ল না আমার।

॥ শেষ ॥